প্রাইজ ও লাইব্রেরীর জন্য মনোনীত

জানুয়ারী, ১৯৬২

জনশিক্ষা গ্রন্থমালা



পুরাণের গল্প

সংস্কৃত সাহিত্যের গল্প, দেশপ্রেমে ভারতবাসী, জ্ঞানে ও কর্মে বাঙ্গালী,
মহাভারতীয় গল্প, রামায়ণী কথা, ধর্মে বাঙ্গালী প্রভৃতি পুস্তক প্রণেতা,
নৈহাটী বঙ্কিম কলেজের বাংলা ভাষার অধ্যাপক

শ্রীপরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

প্রণীত

দেব সাহিত্য কুটীর

প্রকাশ করেছেন—
শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার
দেব সাহিত্য-কুটীর প্রাইভেট্ লিমিটেড
২১, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা—৯

শ্রীপঞ্চমী
১৩৬৮
৫

ছেপেছেন—
এস. সি. মজুমদার
দেব-প্রেস
২৪, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা—৯

প্রকাশকের নিবেদন

দীর্ঘকাল ধরে আমরা বাংলার শিক্ষা ও সাহিত্য-ক্ষেত্রে যে নতুন নতুন অভিযান চালিয়ে আসছি, তা'তে যুক্ত হ'লো একটা নতুনতর প্রচেষ্টা।

স্বল্পশিক্ষিতের দেশে উপরতলার পাঠকদের রুচি আর মন যুগিয়ে চলবার তাগিদ আর যারই থাক, আমরা কিন্তু চিরকালই সাহিত্যের পংক্তিভোজে আমন্ত্রণ জানিয়েছি বাংলার সর্বসাধারণকে। স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বৃদ্ধ, শিক্ষিত-অশিক্ষিত—সবাই যাতে জ্ঞানের আলোকে তাঁদের অন্তরলোককে উদ্ভাসিত ক'রে তুলতে পারেন, সেদিকেই ছিল আমাদের লক্ষ্য। ঐ সাধু উদ্দেশ্যের তাগিদেই আমাদের পূর্বতন প্রচেষ্টার সঙ্গে এবার যোগ করছি সদ্য-প্রকাশিত 'জনশিক্ষা গ্রন্থমালা'।

আমরা হাত বাড়িয়ে চারিদিকের অনেক কিছুকেই আঁকড়ে ধরতে পারি, কিন্তু দাঁড়াতে হবে পায়ের নিচেকার ঐ মাটিতেই। তাই বাইরের জগতের প্রভাব, শিক্ষাসংস্কৃতি কিংবা ব্যক্তিমানসের স্পর্শ থেকে নিজেদের বঞ্চিত না ক'রেও দেশের সুপ্রাচীন ঐতিহ্য ও ভাবধারার উপর নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার কল্পনা অবাস্তব নয়। প্রকৃতপক্ষে আমরা 'জনশিক্ষা গ্রন্থমালা'-পর্যায়ে যে ধরনের বই প্রকাশ করছি, তার অধিকাংশই আমাদের দেশীয় ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, গল্পকাহিনী কিংবা লোকশিক্ষাকে অবলম্বন ক'রেই রচিত হয়েছে।

কত যুগ পরে অবহেলিত জনসাধারণের প্রতি দৃষ্টি পড়েছে সরকারের। জনশিক্ষায় উদ্যোগী হয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার। এই অনুকূল পরিবেশে আমরাও সরকারী প্রচেষ্টায় সহায়তা ক'রে অশিক্ষার অভিশাপ দূরীকরণে সচেষ্ট হয়েছি।

যাঁদের জন্যে আমাদের এই প্রচেষ্টা তাঁরা উপকৃত হ'লেই আমাদের পরিশ্রম সার্থক হবে। ইতি—

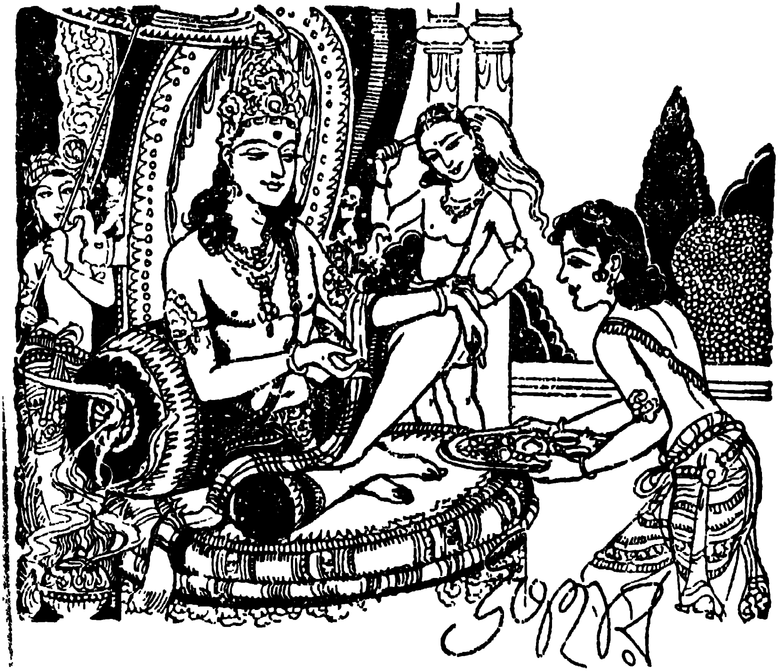
বিনত

প্রকাশক

ভূমিকা

আমাদের দেশের পুরানো ইতিহাস নেই, কিন্তু পুরাণকাহিনী আছে। তাদের সংখ্যা অনেক, আর গল্পের সংখ্যা তো অসংখ্য। তার মধ্য থেকে বাছাই ক'রে কয়েকটি গল্প নিয়ে এ বই লেখা হ'লো। এতে পাবো আমরা অনেক-কাল আগের ইতিহাস, মানুষের জীবনযাত্রার কাহিনী—আর গল্পহিসাবেও এগুলি সুন্দর। ইতি—

শ্রীপরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য



সূচীপত্র

মালাবতী কাহিনী





ব্রহ্মা প্রজাসৃষ্টি ক'রে সন্তানদের আদেশ দিলেন ঃ

'এইবার তোমরাও বিয়ে ক'রে ঘর-সংসার করো। পৃথিবীতে প্রজা-বৃদ্ধি হোক।'

ব্রহ্মার সব সন্তানই মাথা নীচু ক'রে পিতার আদেশ মেনে নিলেন,

শুধু আপত্তি করলেন নারদ

তিনি বললেন ঃ

'পিতা, দয়া ক'রে আমাকে এরূপ আদেশ দেবেন না। আমি কৃষ্ণ নাম জপ ক'রেই জীবন কাটিয়ে দিতে চাই। আমাকে দিয়ে ঘর-সংসার হবে না।'

পুত্রের ঔদ্ধত্য দেখে ব্রহ্মা চটে গিয়ে শাপ দিলেন ঃ

'আমার আদেশ অমান্য করার পাপে তোর গন্ধর্বকুলে জন্ম হবে।'

পুত্র কোন অপরাধ করেননি, তা সত্ত্বেও পিতা তাঁকে শাপ দিয়েছেন, তাই অভিমানে পুত্র নারদও ব্রহ্মাকে শাপ দিলেন ঃ

'পিতা, বিনা অপরাধে আমাকে শাস্তি দিয়েছেন। এই পাপে আপনিও তিন কল্প কাল কারো পূজা পাবেন না।'

ব্রহ্মার বাক্য কখনও ব্যর্থ হ'তে পারে না—তাই নারদকে গন্ধর্বকুলে জন্ম নিতে হ'লো।

* * *

গন্ধর্বদের রাজা—কোন অভাব নেই তাঁর। ধনজন, হাতী-ঘোড়া—সবই আছে প্রচুর, অথচ মনে তাঁর আনন্দ নেই। ভাগ্য-দোষে তিনি পুত্রহীন—পুত্রের অভাবেই তাঁর নিকট জগৎ-সংসার শূন্যময় মনে হয়। সব থেকেও যেন তাঁর কিছুই নেই।

সেই গন্ধর্বরাজ পুত্রের কামনায় শিবের উপাসনা করবেন। মহামুনি বশিষ্ঠের কাছ থেকে মন্ত্র নিয়ে তিনি শিবের আরাধনায় রত হ'লেন।

দিন যায়, দিনে দিনে মাস যায়, মাসে মাসে বছর ঘুরে আসে—কিন্তু তবু তিনি শিবের দেখা পেলেন না। আরো কঠোর ভাবে তিনি তপস্যা করতে লাগলেন।

কেটে গেল এক যুগ—বারো বছর, তারপর আরো এক যুগ। এমনি ভাবে ধীর স্থির হ'য়ে বসে তিনি তপস্যা করছেন বছরের পর বছর, এমনি ক'রে কাটল একশ' বছর। এতদিনে তিনি সাধনায় সিদ্ধিলাভ করলেন—মহাদেব সন্তুষ্ট হ'লেন। ত্রিশূল হাতে নিয়ে বলদের পিঠে চড়ে দেখা দিলেন মহাদেব। তারপর বললেন গন্ধর্বরাজকে ঃ

'বৎস, তোমার আরাধনায় প্রীত হ'য়েছি—কি বর চাও ?'

গন্ধর্বরাজ সাষ্টাঙ্গে প্রণাম ক'রে মহাদেবকে বললেন ঃ

'প্রভু, আমি হরিভক্তি চাই, আর চাই এক পুত্র।'

আপত্তি করলেন মহাদেব—দুই বর চলবে না, যে কোন এক বর দিতে পারেন। আর তা' ছাড়া হরিভক্তি তো সোজা ব্যাপার নয়—বরং স্বর্গের রাজা ক'রে দেওয়া অনেক সোজা।

কিন্তু ভক্তও বড় সাধারণ নন। তিনি নাছোড়বান্দা হ'য়ে শেষটায় বললেন ঃ

'বেশ, যদি আপনি আমায় হরিভক্তি দিতে না চান, তবে আর বেঁচে থেকে লাভ নেই। আপনার সাম্‌নেই আমি নিজের হাতে আমার মাথা কেটে ফেলবো।'

মহাদেব আর করেন কি ? বাধ্য হ'য়েই বললেন ঃ

'থাক, আর মাথা কাটবার দরকার নেই। তুমি হরিভক্তিও পাবে, আর এক পুত্র পাবে, সেও হবে হরিভক্ত।'

যথাকালে গন্ধর্বরাজের এক পুত্র হ'লো। বশিষ্ঠদেব এসে আশীর্বাদ করলেন—পুত্রের নাম রাখলেন উপবর্হণ।

এই উপবর্হণই শাপগ্রস্ত নারদ!

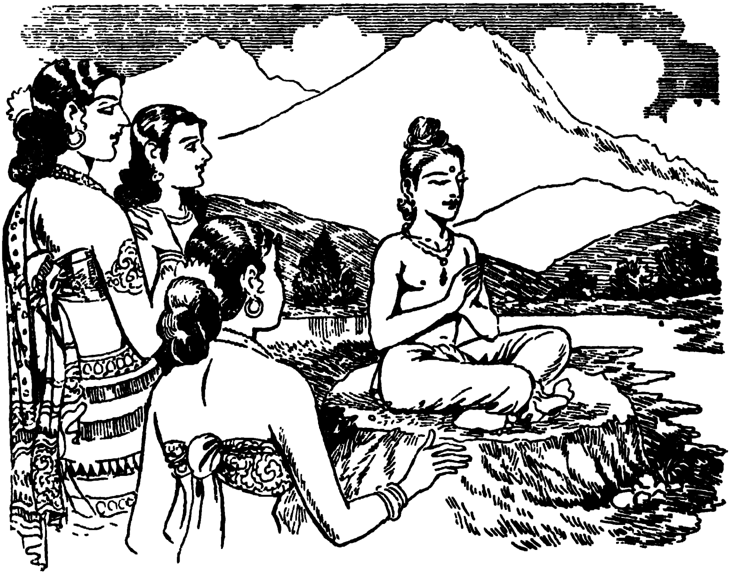
দিনে দিনে পুত্র বড় হ'তে লাগলো। রূপে গুণে সে আর সবাইকে ছাড়িয়ে গেলো। বশিষ্ঠদেব নিজে এসে তাকে হরিমন্ত্র দান করলেন। যৌবনকালে হরিমন্ত্রের উপাসক হ'য়ে উপবর্হণ গেলেন তপস্যা করতে।

গণ্ডকী নদীর তীরে ব'সে উপবর্হণ হরির ধ্যান করছেন—এমন সময় একদিন পঞ্চাশটি গন্ধর্বরমণী এলো নদীতে স্নান করতে। উপবর্হণের রূপ দেখে তারা মুগ্ধ হ'য়ে গেলো। তারা উপবর্হণকে স্বামিরূপে পেতে ইচ্ছা করলো।

যোগাসনে ব'সে সবাই দেহত্যাগ ক'রে চিত্ররথ রাজার ঘরে জন্ম নিল। তারপর উপবর্হণের সঙ্গে বিয়ে হ'লো সেই পঞ্চাশটি মেয়ের। জপ তপ বিসর্জন দিয়ে উপবর্হণ ফিরে এলেন ঘরে। তারপর গন্ধর্বদের রাজা হ'য়ে তিনি রাজ্যশাসন করতে লাগলেন।

একদিন উপবর্হণ হরিগুণ গান করতে করতে পুষ্করতীর্থে

গিয়ে উপস্থিত হ'লেন। দেখতে পেলেন, সেখানে দেবতারা সবাই ব'সে স্বর্গের অপ্সরা রম্ভার নাচ দেখছেন। রম্ভার নাচ



উপবর্হণের রূপ দেখে তারা মুগ্ধ হ'য়ে গেলো। —১০ পৃষ্ঠা

দেখে উপবর্হণের মন চঞ্চল হ'য়ে উঠলো। তা দেখে ব্রহ্মা তাঁকে আবার শাপ দিলেন ঃ

'গন্ধর্বের দেহ পরিত্যাগ ক'রে তুই শূদ্রাণীর ঘরে জন্ম নিবি।'

ব্রহ্মার শাপে উপবর্হণ যোগাসনে ব'সে দেহত্যাগ করলেন। তাঁর পঞ্চাশটি স্ত্রীই একযোগে কাঁদতে শুরু করলেন। তাঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন মালাবতী—উপবর্হণের সব চেয়ে

প্রিয়া পত্নী। তিনি মাটিতে লুটিয়ে চীৎকার ক'রে কাঁদতে লাগলেন। কাঁদতে কাঁদতে তিনি মূর্ছিত হ'য়ে পড়লেন।

রাত্রিশেষে মালাবতীর চৈতন্য হ'লো। তিনি মৃত স্বামীর দেহ কোলে নিয়ে দয়াময় হরিকে ডাকতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর ক্রোধ গিয়ে পড়লো দেবতাদের উপর। তিনি বলতে লাগলেন ঃ

'দুরাত্মা দেবতাগণ, আমার স্বামীকে যদি তোমরা বাঁচিয়ে না দাও, তবে তোমাদের দর্প আমি ধ্বংস করবো। নারায়ণ, আমার শাপে তোমাকেও দুঃখ ভোগ করতে হবে। ব্রহ্মা, পুত্রের শাপে তোমার পূজা লোপ পেয়েছে, আমার শাপে তোমার অধিকারও লোপ পাবে। আর মহাদেব, আমার স্বামীকে যদি বাঁচিয়ে না দাও, তবে তোমার তত্ত্বজ্ঞান লোপ পাবে। ধর্ম, মৃত্যু—তোমাদেরও বলি—সতীর অভিশাপের হাত থেকে তোমরা কেউই রেহাই পাবে না।'

মালাবতীর কথা শুনে দেবতারা বুঝলেন—সতীর শাপ থেকে তাঁদের রেহাই নেই। তাই তাঁরা সবাই মিলে ছুটে গেলেন পরমেশ্বরের কাছে। ব্রহ্মা, শিব, ধর্ম, যম—সবাই হাতজোড় ক'রে পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে লাগলেন। বললেন ঃ

'ভগবান্, তুমি আমাদের রক্ষা কর। নইলে সতী মালাবতীর শাপে আমাদের দেবত্ব, আমাদের অধিকার সব লোপ পাবে।'

দেবতাদের এই দুর্দশায় নারায়ণের মন টললো। দেবতারা তাই দৈববাণী শুনতে পেলেন :

'ভয় নেই, তোমরা সকলে মালাবতীর কাছে যাও—তোমাদের রক্ষার উপায় হবে।'

দেবতারা বৈকুণ্ঠ ছেড়ে আবার ছুটলেন মর্ত্যলোকে মালাবতীর কাছে। মালাবতী মৃত স্বামীকে কোলে নিয়ে ব'সে আছেন—দু'চোখে জলের ধারা নামছে। দেবতাদের দেখে মালাবতী তাঁদের প্রণাম করলেন।

এমন সময় এক ব্রাহ্মণসন্তান এসে উপস্থিত হলেন—মাথায় ছাতা, হাতে পুঁথি। সহসা দেবতাদের দিকে চোখ পড়তেই সেই ব্রাহ্মণবালক জিজ্ঞেস করলেন :

'সব দেবতাদেরও যে এখানে দেখছি—ব্যাপার কী! ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, পবন, চন্দ্র, সূর্য—আপনারা সব এখানে কেন?'

তারপরই মালাবতীর দিকে তাকিয়ে বললেন :

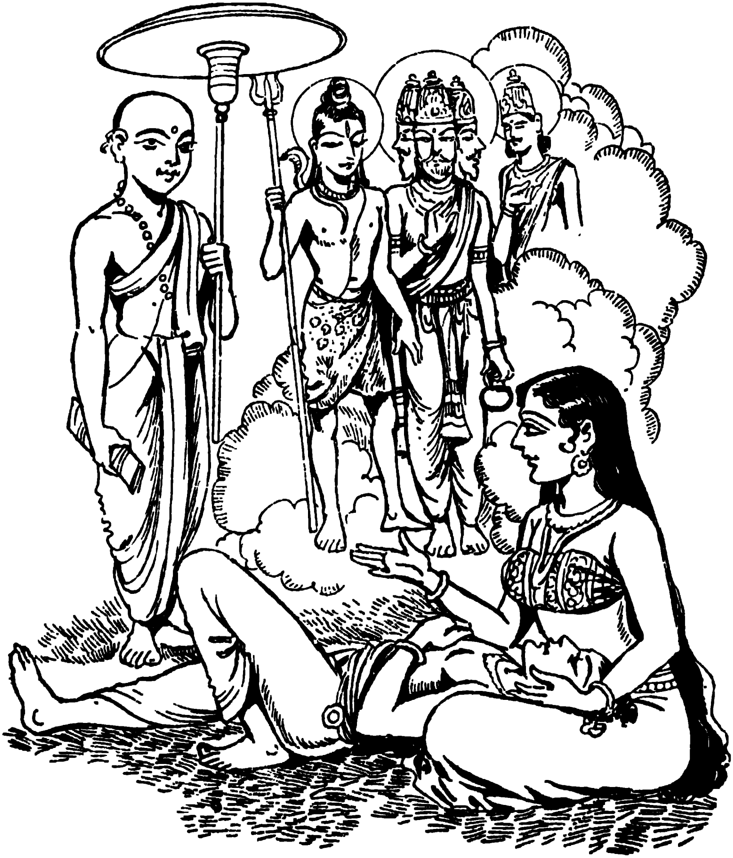
'তুমি কে নারী—মৃতদেহকে আঁকড়ে ধ'রে ব'সে আছ? মনে হয়, ওই মৃত ব্যক্তি তোমার স্বামী। কী ব্যাপার, বলতো শুনি?'

মালাবতী ধীরে ধীরে সমস্ত কাহিনী বর্ণনা করলেন, শেষটায় বললেন :

'দেবতারা যদি আমার স্বামীকে বাঁচিয়ে না দেন, তাহ'লে আমি সবাইকে অভিশাপ দেবো।'

ব্রাহ্মণবালক তাঁকে বললেনঃ

'কেন এত উতলা হচ্ছ সতী! মানুষ যে যেমন কাজ করে,



তেমন ফলভোগ তাকে করতে হয়। কাজেই শোক করছো কেন? আচ্ছা বলতো শুনি, কোন্ রোগে তোমার স্বামীর মৃত্যু

হয়েছে ? আমি একজন চিকিৎসক—রোগের বিবরণ শুনে তার প্রতিকার করতে পারি। এমন কি কালের লীলায় যে মরেছে, তাকেও আমি বাঁচাতে পারি। অসাধ্য বলতে আমার কিছু নেই। আমি ইচ্ছে করলে, জরা, যম, কাল আর ব্যাধিদেরও এখানে এনে হাজির করতে পারি। কাজেই শোক না ক'রে আমার প্রশ্নের উত্তর দাও।'

ব্রাহ্মণবালকের কথা শুনে মালাবতী অবাক্ হ'য়ে গেলেন। তিনি বললেনঃ 'বয়সে বালক হ'লেও বুদ্ধিতে আপনি বিচক্ষণ—আপনার কথা শুনে আশা হচ্ছে, আবার আমার স্বামী হয়তো বেঁচে উঠবেন। কিন্তু তার আগে দয়া ক'রে আপনি একবার যম, কাল আর মৃত্যুকন্যাকে এখানে এনে হাজির করুন—তাঁদের কাছে আমার কয়েকটা প্রশ্ন আছে। তারপর আপনার প্রশ্নের উত্তর দেবো।'

চোখের পাতা ফেলতে না ফেলতে দেখা গেলো, যম, কাল আর মৃত্যুকন্যা এসে উপস্থিত হয়েছেন।

ঘোর কৃষ্ণবর্ণা মৃত্যুকন্যা—ছয়টি হাত, তাঁর স্বামী কালের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন, আর তাঁদের চৌষট্টি পুত্র ঘিরে আছে পিতামাতাকে।

তারপর মালাবতী তাকালেন কালের দিকে—ভীষণ আকৃতি, কিন্তু দেহ থেকে জ্যোতি ফুটে বেরুচ্ছে। ষোল হাত, ছয় মুখ, চব্বিশটি চোখ আর ছয়টি পা তাঁর—সর্বক্ষণ তিনি নারায়ণের নাম জপ করছেন।

মালাবতী দেখলেন, তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছে ব্যাধিগণ—বয়সে বৃদ্ধ হ'লেও তারা মাতৃস্তন্য পান করছে।

ধর্মমূর্তি যমের দিকে তাকিয়ে মালাবতী বললেন ঃ

'প্রভু, আপনি তো স্বয়ং ধর্ম। বিচার ক'রে বলুন, কোন্ অপরাধে আমার স্বামীর মৃত্যু হ'লো।'

যম উত্তর করলেন ঃ

'কালপ্রাপ্ত হ'লে সবাইকে মরতে হয়। ঈশ্বরের আজ্ঞায়ই আমরা জীবের প্রাণহরণ ক'রে থাকি। সময় পূর্ণ না হ'লে, কাউকে আমরা নিতে পারিনে। বিশ্বাস না হয়, এই তো মৃত্যুকন্যা আছেন, তাঁকেই জিজ্ঞেস করো।'

মালাবতী তখন মৃত্যুকন্যার দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ

'মৃত্যুকন্যা, আপনি তো নারী—অবলা নারীর দুঃখও বুঝতে পারেন। আমার স্বামী কোন্ অপরাধে প্রাণহীন হলেন আর আমরা পঞ্চাশটি বিধবা সেজন্যে দুঃখভোগ করছি?'

বিষণ্নবদনে মৃত্যুকন্যা উত্তর দিলেন ঃ

'এর জন্যে আমি দায়ী নই সতী। বিধির আদেশেই আমাকে কাজ করতে হয়। আমি আর এ সব দেখতে পারি না। —আমার মরণ হ'লেই বাঁচি। আমি আর আমার পুত্রগণ কালের আদেশেই মানুষের প্রাণ হরণ করি। যদি বিশ্বাস না হয়, কাল এখানে উপস্থিত আছেন, তাঁকে জিজ্ঞেস করলেই সব জানতে পারবে।'

তখন সতী মালাবতী জোড়হাতে কালকে সম্বোধন ক'রে বললেন ঃ

'প্রভু, অকালে আমার স্বামীর প্রাণ হরণ করলেন কেন, দয়া ক'রে আমাকে বলুন।'

কাল মধুর বচনে বললেন ঃ

'আমিই বা কি, যমই বা কি, আর ব্যাধিই বা কি—আমাদের কারো কোন ক্ষমতা নেই ; আমরা সবাই ঈশ্বরের আদেশে কাজ ক'রে যাচ্ছি। কাজেই আমাদের নিকট তোমার স্বামীর প্রাণ ভিক্ষা ক'রে কিছু লাভ নেই। যিনি সকল কিছুর মূলে, যাঁর আদেশে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরও পরিচালিত হচ্ছেন, সর্বমূলাধার সেই শ্রীকৃষ্ণের শরণ নাও। একমাত্র তিনিই তোমার স্বামীর প্রাণ ফিরিয়ে দিতে পারেন।'

এই ব'লে মহাকালও চুপ করলেন।

তখন ব্রাহ্মণরূপী ভগবান্ মালাবতীকে লক্ষ্য ক'রে বললেন ঃ

'যম, কাল আর মৃত্যুকন্যার কথা তো নিজেই শুনলে, তোমার কি আর কিছু জিজ্ঞেস করবার আছে ?'

মালাবতী তখন জানতে চাইলেন, কেন মানুষের ব্যাধিতে মৃত্যু হয়, আর কেনই বা তারা সুস্থ থাকে।

তখন ব্রাহ্মণবালক বিভিন্ন রোগের নাম, উৎপত্তি, বিবরণ ও চিকিৎসার কথা খুলে বললেন। কোন্ কোন্ নিয়ম পালন করলে মানুষ নীরোগ ও সুস্থ থেকে দীর্ঘজীবন লাভ করতে পারে, তার কথাও জানালেন।

২

ব্রাহ্মণবালকের কথা শুনে মালাবতী আবার বললেন ঃ

'প্রভু, এবার আমার স্বামীর জীবন দান করুন।'

ব্রাহ্মণবালক তখন দেবতাদের দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ

'আপনারা যদি এই মালাবতীর স্বামীকে বাঁচিয়ে না দেন, তবে এর শাপে আপনাদের সকলেরই সর্বনাশ হবে।'

এমন সময় ব্রহ্মা উঠে বললেন ঃ

'এই উপবর্হণ আমারই পুত্র—এখনও এর হাজার বছর পরমায়ু আছে। কাজেই আমি একে বাঁচিয়ে দিচ্ছি।'

এই ব'লে ব্রহ্মা উপবর্হণের মৃতদেহে কমণ্ডলুর জল ছিটিয়ে দিলেন। অমনি দেহে যেন চেতনা জাগলো—মৃতদেহ সুন্দর হ'য়ে উঠলো। তখন শিব দিলেন তাকে জ্ঞান, ধর্ম দিলেন তাকে ধর্মজ্ঞান, বিষ্ণু প্রাণ দিলেন, সূর্য দর্শনশক্তি দিলেন, পবন শ্বাসপ্রশ্বাস দিলেন, সরস্বতী দিলেন বাক্‌শক্তি। কিন্তু তখনও উপবর্হণ মৃতের ন্যায় পড়ে রইলেন।

এই দেখে মালাবতী পরমেশ্বরকে ধ্যান করতে লাগলেন। ধ্যানে তুষ্ট হ'য়ে ব্রাহ্মণবালক পরমেশ্বর রূপে দেখা দিয়ে উপবর্হণের দেহে পরমাত্মার সঞ্চার করলেন। সঙ্গে সঙ্গে উপবর্হণ যেন ঘুম ভাঙ্গবার পর উঠে বসলেন।

তারপর দেবতাদের প্রণাম ক'রে তাঁদের আশীর্বাদ নিয়ে উপবর্হণ আর মালাবতী ফিরে গেলেন আপন গৃহে। আত্মীয়-স্বজন সবাই মালাবতীকে ধন্য ধন্য করলো।

তুলসী-শঙ্খচূড় কথা



গোলোকবিহারী শ্রীকৃষ্ণ —অসংখ্য তাঁর ভক্ত আর অনুচর। কত শত গোপ আর গোপী রাতদিন তাঁর সেবায় নিযুক্ত থাকেন। কৃষ্ণের নিকট সবাই প্রিয়, সবাই আপন। রাধিকায় আর গোপীতে তাঁর কোন ভেদ নেই, তিনি সবারই মনের কামনা পূর্ণ করেন।

একদিন শ্রীকৃষ্ণ যখন এক গোপীর সঙ্গে আনন্দ করছেন, তখন রাধিকা সহসা সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। কৃষ্ণকে গোপীর সঙ্গে দেখে রাধিকা ভীষণ চটে গিয়ে কৃষ্ণকে খুবই তিরস্কার করলেন, আর গোপীকে দিলেন অভিশাপ। সেই অভিশাপে গোপীকে মর্ত্যে মানবীরূপে জন্ম নিতে হবে।

গোপী অভিশাপের কথা শুনে দুঃখে ভেঙ্গে পড়লেন।

কৃষ্ণ তখন গোপীকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন ঃ

'ভারতে জন্মগ্রহণ ক'রে তুমি তপস্যার প্রভাবে নারায়ণকে পতিরূপে লাভ করবে—দুঃখ করো না।'

* * * *

কৃষ্ণের এক গোপ-সখা সুদামা কৃষ্ণের অতি প্রিয় ভক্ত, সহচর এবং তাঁরি অংশস্বরূপ। সুদামারও ঐ গোপীর প্রতি ছিল অত্যন্ত আকর্ষণ। রাধা যখন ঐ খবর শুনতে পেলেন, তখন সুদামাকে অভিশাপ দিলেন, মর্ত্যে মানবের ঘরে তার জন্ম হবে।

* * * *

ধর্মধ্বজ রাজা—অতি গুণবান্। তাঁর পত্নী মাধবী—তিনিও পরম গুণবতী। মাধবীর এক সর্বসুলক্ষণা কন্যা হ'লো—তার তুলনা নেই কোথাও, এই কারণে তার নাম হ'লো তুলসী।

জন্মের পরই কন্যা তপস্যা করতে যেতে চাইলেন। নিষেধ করলেন তাঁর বাপ-মা, কিন্তু তুলসী কারো মানা শুনতে চাইলেন না—তিনি যাবেনই। অগত্যা তাঁরা সম্মতি দিলে তুলসী গেলেন বদরী-কাননে। সেখানে গিয়ে নারায়ণকে পতিরূপে লাভ করবার জন্যে তিনি কঠোর তপস্যা করতে লাগলেন। শীতকালে জলের মধ্যে বসে থাকেন, বর্ষার বৃষ্টি যায় তাঁর দেহের উপর দিয়ে। গ্রীষ্মকালে চারদিকে আগুনের কুণ্ড ক'রে তার মাঝ-খানে বসে তপস্যা করেন। ক্রমশঃ তাঁর তপস্যা কঠোরতর হ'য়ে

উঠতে লাগলো—শেষ পর্যন্ত তিনি অনাহার হ'য়েই তপস্যায় রত হলেন। শেষে তাঁর কঠোর তপস্যায় তুষ্ট হ'য়ে ব্রহ্মা তাঁকে দেখা দিলেন। ব্রহ্মা বললেন ঃ

'বর চাও।'

তুলসী লজ্জিত হ'য়ে বললেন ঃ

'প্রভু, আপনি তো জানেন—পূর্বজন্মে গোলোকে গোপী ছিলাম—রাধার শাপে মর্ত্যে এসে জন্ম নিয়েছি। কৃষ্ণ সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন, নারায়ণকে পতিরূপে পাবো, সেই বরই আমি চাই।'

ব্রহ্মা বললেন ঃ

'হ্যাঁ, তুমি জাতিস্মরা—পূর্বজন্মের কথা স্মরণ আছে তোমার। সুদামাও দনুবংশে শঙ্খচূড় নামে জন্মগ্রহণ করেছে। নারায়ণের অংশজাত শঙ্খচূড়ই হবে তোমার স্বামী, তোমাদের দু'জনের মিলন হবে—আমি এই বর দিয়ে যাচ্ছি।'

তুলসী বললেন ঃ

'প্রভু, নারায়ণ অপেক্ষা কৃষ্ণের প্রতিই আমার আকর্ষণ বেশী। কৃষ্ণের প্রতি আমার প্রণয় যেন চিরকাল অটুট থাকে, এই আশীর্বাদ করুন।'

ব্রহ্মা তখন তুলসীকে রাধামন্ত্র দিয়ে বললেন ঃ

'তুমি ভক্তিভরে রাধামন্ত্র জপ কর, তবেই মনোমত বর পাবে।'

ব্রহ্মা চলে গেলেন। তুলসী সর্বক্ষণ রাধামন্ত্র জপ করছেন। রাধামন্ত্র জপ ক'রে ক'রে তাঁর মনে জাগলো প্রেম ভাব, তিনি চঞ্চল হ'য়ে উঠলেন। কখনো শুয়ে থাকেন, কখনো উঠে হাঁটেন। এ ভাবে কিছু দূর গিয়ে আবার শুয়ে পড়লেন। তারপর ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখলেন—এক অতি সুন্দর যুবা পুরুষ তাঁর কাছে এসে বসেছেন। এমন সময় তাঁর ঘুম ভেঙ্গে গেল। তিনি ব্যাকুল হ'য়ে চারদিকে তাকাতে লাগলেন।

ওদিকে শঙ্খচূড় কৃষ্ণমন্ত্র জপ ক'রে সিদ্ধিলাভ করেছেন, ব্রহ্মার বরও পেয়েছেন। তারপর ব্রহ্মার আদেশে মনোমত পত্নী পাবার আশায় বদরী-কাননে এসে উপস্থিত হয়েছেন।

তুলসী যখন চঞ্চল ভাবে চারদিকে তাকাচ্ছেন, ঠিক সেই সময় শঙ্খচূড় এসে দাঁড়ালেন তাঁর সামনে। শঙ্খচূড় ছিলেন অতি সুপুরুষ। তাঁকে সামনে দেখে তুলসী মনে মনে মোহিত হ'লেও লজ্জায় মুখ ফুটে কিছু বলতে পারলেন না।

শঙ্খচূড়ই এগিয়ে এসে তাঁর পরিচয় জিজ্ঞেস করলেন।

তুলসী তখন নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন ঃ

'কিন্তু আপনি কে ? আর কেনই বা এখানে এসেছেন ? শাস্ত্রে আছে, অপরিচিতা নারীর কাছে একলা থাকতে নেই—আপনি এখানে থাকবেন না, এখনি চলে যান।'

এরপর তুলসী নারীর নানা রকম দোষ বর্ণনা ক'রে বললেন যে নারীসঙ্গ সব সময়েই ত্যাগ করা উচিত।

শঙ্খচূড় তুলসীর কথার প্রতিবাদ ক'রে নারীর গুণকীর্তন করতে লাগলেন। তারপর বললেন ঃ

'তুমি যেমন পূর্বজন্মের কথা জান, আমিও তেমনি জানি। তুমি ছিলে গোপী, আমি ছিলাম সুদামা। রাধার অভিশাপে গোলোকে আমাদের মিলন হয়নি। সেই অপূর্ণ বাসনা পূর্ণ করবার জন্যই মর্ত্যে জন্ম নিয়েছি। তারপর কৃষ্ণমন্ত্র জপ ক'রে ব্রহ্মার বর লাভ করেছি এবং তাঁর আদেশেই তোমার কাছে এসেছি।'

শঙ্খচূড়ের কথা শুনে তুলসী প্রীত হ'য়ে বললেন ঃ

'প্রভু, আপনার কথায় আমি মুগ্ধ হয়েছি। যে-সব কথা বলেছি সে-সব আমার প্রাণের কথা নয়। আপনাকে পরীক্ষা করবার জন্যেই আমি এ সমস্ত কথা বলেছিলাম।'

তাঁরা যখন এভাবে কথা বলছেন, তখন ব্রহ্মা এসে সেখানে উপস্থিত হ'য়ে বললেন ঃ

'তোমরা এভাবে কথা কাটাকাটি করছ কেন? তোমরা দু'জনেই রূপে গুণে তুলনাবিহীন—পূর্বজন্ম থেকেই তোমাদের মিলন নির্দিষ্ট হ'য়ে আছে। কাজেই গন্ধর্বমতে তোমরা বিয়ে করো। শঙ্খচূড় যুদ্ধে দেব-দৈত্যকে পরাজিত করেছে—তাকে বিয়ে ক'রে তুলসী সুখী হবে। আর তুলসী, তুমি পরজন্মে আবার বৈকুণ্ঠে গিয়ে নারায়ণের সঙ্গে মিলিত হবে।'

এই বলে ব্রহ্মা চলে গেলেন।

শঙ্খচূড় গন্ধর্বমতে তুলসীকে বিয়ে করলেন—স্বর্গ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হ'লো। শঙ্খচূড় তুলসীকে সঙ্গে নিয়ে নানা তীর্থে ঘুরে বেড়ালেন। তারপর গৃহে ফিরে এসে শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যাপৃত হ্লেন। একে একে দেবতাদের সবাইকে যুদ্ধে হারালেন। বিপন্ন হ'য়ে দেবতারা তখন গেলেন ব্রহ্মার কাছে। ব্রহ্মা তাঁদের নিয়ে গেলেন শিবের নিকট। মহাদেব তখন সবাইকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন বৈকুণ্ঠে নারায়ণের নিকট।

নারায়ণ সব কিছুই জানতেন। তিনি বললেন ঃ

'রাধার অভিশাপে আমার প্রিয় সুদামাই শঙ্খচূড় দৈত্য নামে জন্মগ্রহণ করেছে—তার শাপ মোচন হ'লেই সে আবার বৈকুণ্ঠে ফিরে আসবে। কিন্তু আমার শূল ছাড়া শঙ্খচূড়কে বধ করা যাবে না।'

এই বলে নারায়ণ মহাদেবের হাতে শূল দিয়ে বললেন ঃ

'তুমি এই শূলের সাহায্যে শঙ্খচূড়কে বধ করবে।'

তারপর ব্রহ্মার দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ

'তুমি তাকে যে মঙ্গল কবচ দিয়েছিলে, সেই মঙ্গল কবচ তার দেহে থাকা পর্যন্ত, তার মৃত্যু হবে না। কাজেই সে কবচ হরণ করতে হবে। আর তার স্ত্রী তুলসী পরম সতী। তার সতীত্ব যতদিন পর্যন্ত অটুট থাকবে, ততদিন সেই সতীত্বের তেজেই শঙ্খচূড় বেঁচে থাকবে, কিছুতেই তার প্রাণহরণ করা যাবে না। কাজেই যে ভাবে হোক তুলসীকে তার সাধনা

থেকে ভ্রষ্ট করতে হবে। তারপরই সে আমার প্রিয়তমা হ'য়ে বৈকুণ্ঠে স্থান পাবে। যাক, তোমরা যাও, আমিই এ কাজের ভার নিলাম।'



'তুমি এই শূলের সাহায্যে শঙ্খচূড়কে বধ করবে।'—২৪ পৃষ্ঠা

নিশ্চিন্ত হ'য়ে দেবতারা বিদায় নিলেন।

নারায়ণের শূল হাতে পেয়ে মহাদেব যুদ্ধের জন্য তৈরী হ'য়ে পুষ্পদন্তকে দূত ক'রে পাঠালেন শঙ্খচূড়ের কাছে।

পুষ্পদন্ত শঙ্খচূড়কে বললেঃ

'আমি মহাদেবের দূত। তুমি যদি দেবতাদের অধিকার ফিরিয়ে না দাও, তবে স্বয়ং মহাদেব তোমাকে যুদ্ধে হত্যা করবেন

—এই সংবাদ জানানোর জন্যেই মহাদেব আমাকে তোমার নিকট পাঠালেন।'

দূতের কথা শুনে শঙ্খচূড় বললেন ঃ

'মহাদেবকে বলো, কাল সকালে তাঁর সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে আমার সাক্ষাৎ হবে।'

পুষ্পদন্ত মহাদেবকে সব কিছু জানালে যত দেবতা আর ভূতপ্রেত সবাই যুদ্ধের জন্য তৈরী হ'লো।

এদিকে শঙ্খচূড় ঘরে ফিরে তুলসীকে সমস্ত জানিয়ে পরদিনের যুদ্ধের জন্য তৈরী হলেন।

পরদিন প্রাতে ঘুম থেকে উঠে শঙ্খচূড় ভক্তিভরে পূজা-অর্চনা, দান-ধ্যান শেষ ক'রে পুত্র সুচন্দ্রের হাতে রাজ্যের ভার সঁপে দিলেন। তারপর সসৈন্যে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হলেন। মহাদেবও সৈন্য-সামন্ত নিয়ে সেখানে অপেক্ষা করছিলেন। শঙ্খচূড় সেখানে গিয়েই ভক্তিভরে মহাদেব, মহাদেবী, কার্তিক-গণেশাদি দেবতাদের প্রণাম করলেন।

তখন হাসতে হাসতে মহাদেব বললেন ঃ

'দৈত্যপতি, তুমি বিষ্ণুভক্ত, অকারণ দেবতাদের সঙ্গে কলহ করছ কেন ? তাঁদের রাজ্য তাঁদের ফিরিয়ে দাও। তোমরা এবং দেবতারা উভয়েই কশ্যপের সন্তান। জ্ঞাতি-শত্রুতা কি ভাল ?'

উত্তরে শঙ্খচূড় বললেন ঃ

'জ্ঞাতি-শত্রুতা যদি ভালই না হবে তবে দেবতারা বলী,

হিরণ্যাক্ষ, হিরণ্যকশিপু, শুম্ভ, নিশুম্ভ প্রভৃতির উপর অত্যাচার করেছিলেন কেন? দেবতারা অমৃত নিলেন, দৈত্যরা তার ভাগ পায়নি কেন?'

তারপরই আবার বিনয়ের ভাব দেখিয়ে বললেন:

'মহাদেব, আপনার সঙ্গে আমার কোন শত্রুতা নেই—দেবতা আর দৈত্যে যুদ্ধ, তার মধ্যে আপনি কেন? আপনার সঙ্গে পরাজয়ে আমার কোন লজ্জা নেই, দুঃখও নেই, কিন্তু যদি আপনি পরাজিত হন?'

মহাদেব বললেন:

'তুমিও ব্রহ্মবংশে জন্মেছ—তোমার সঙ্গে পরাজয়ে আমার লজ্জা কি? স্বয়ং নারায়ণ এবং পরমা প্রকৃতিও তো দৈত্য-দানবের সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন!'

শেষ পর্যন্ত আলাপ-আলোচনার ফল কিছুই হ'লো না। যুদ্ধ অবধারিত হ'য়ে উঠলো। প্রথমেই কার্তিকের সঙ্গে শঙ্খচূড়ের যুদ্ধ আরম্ভ হ'লো—সে এক ভীষণ যুদ্ধ! দু'পক্ষের কেউ আর হার মানেন না। একবার কার্তিকের বাণে শঙ্খচূড় মূর্ছিত হ'য়ে পড়েন, আর বার শঙ্খচূড়ের বাণে কার্তিক মূর্ছিত হ'য়ে পড়েন।

তখন মহাদেব অন্যান্য দেবতাদের যুদ্ধে পাঠালেন। দেব-দৈত্যে যুদ্ধ সাংঘাতিক আকার ধারণ করলো। সূর্যের সঙ্গে বিপ্রচিত্তির, ইন্দ্রের সঙ্গে বৃষপর্বার, চন্দ্রের সঙ্গে দম্ভের, কালের সঙ্গে কালেশ্বরের, কুবেরের সঙ্গে কালকেয়ের, মৃত্যুর সঙ্গে ভয়ংকরের, এমনিভাবে যুদ্ধ চলতে লাগলো।

শেষ পর্যন্ত দেবতারা রণে ভঙ্গ দিয়ে যিনি যেদিকে পারলেন ছুটে পালালেন। তখন কালী নিজে নামলেন যুদ্ধে—শঙ্খচূড়ও এগিয়ে এলেন। সে এক তুমুল ব্যাপার। ত্রিভুবন ভয়ে কাঁপতে লাগলো, যেন প্রলয়কাল উপস্থিত হয়েছে। চারদিকে অগ্নিবৃষ্টি হ'তে লাগলো। কালী সাংঘাতিক সাংঘাতিক অস্ত্র হানতে লাগলেন—কিন্তু শঙ্খচূড় সবগুলি কেটে দিতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত ধৈর্যহারা হ'য়ে কালী পাশুপত অস্ত্র হাতে নিলেন। তখনই দৈববাণী হ'লো ঃ

'দয়া ক'রে ওই অস্ত্র সংবরণ কর, দৈত্যের দেহে কবচ আর তার নারীর সতীত্ব থাকতে তার মৃত্যু হবে না।'

কালী তখন পাশুপত অস্ত্র সংবরণ ক'রে পুনরায় দৈত্য ধ্বংস করতে লাগলেন। শঙ্খচুড় শেষ পর্যন্ত কালীর সঙ্গে বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। কালী তাঁকে দু'হাতে ধরে উপরে তুলে আছাড় দিয়ে মাটিতে ফেললেন। দৈত্য সঙ্গে সঙ্গেই মাটি থেকে লাফিয়ে উঠলেন।

শেষ পর্যন্ত দৈত্যসেনা রণে ভঙ্গ দিলেন। তখন কালী ফিরে গেলেন মহাদেবের কাছে। মহাদেব বললেন ঃ

'তুমি বিশ্রাম কর। আমি দৈত্যকে নিপাত ক'রে আসি।'

মহাদেব যখন পাশুপত অস্ত্র হাতে নিয়ে শঙ্খচুড়ের দিকে এগিয়ে গেলেন, তখনি আবার দৈববাণী হ'লো ঃ

'পাশুপত অস্ত্র সংবরণ কর মহাদেব। দৈত্যের দেহে কবচ আর তার নারীর সতীত্ব থাকতে তার মৃত্যু হবে না।'

মহাদেব অস্ত্র হাতে ফিরে এলেন।

এদিকে নারায়ণ এক ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের বেশে গিয়ে উপনীত হলেন দৈত্যপতি শঙ্খচূড়ের পাশে। ব্রাহ্মণ দেখে শঙ্খচূড় জিজ্ঞেস করলেন ঃ

'কি প্রার্থনা আপনার, বলুন ব্রাহ্মণ।'

বিনয়ে ব্রাহ্মণ বললেন ঃ

'দৈত্যপতি, শুনেছি আপনার মতো দাতা নাকি ত্রিভুবনে নেই; তাই বড় আশা নিয়েই আপনার কাছে এসেছি। আমি সাত দিন অনাহারে আছি, চলবার শক্তি নেই, কথা বলবার ক্ষমতা নেই, গলা পর্যন্ত শুকিয়ে আসছে—'

শঙ্খচূড় ব্রাহ্মণের কথায় ব্যাকুল হয়ে বললেন ঃ

'বলুন ব্রাহ্মণ, আপনার কি প্রার্থনা ?'

ব্রাহ্মণ বললেন ঃ

'বলছি মহারাজ! কিন্তু তার আগে শপথ করুন—আমি যা' চাই, আমাকে তাই দেবেন।'

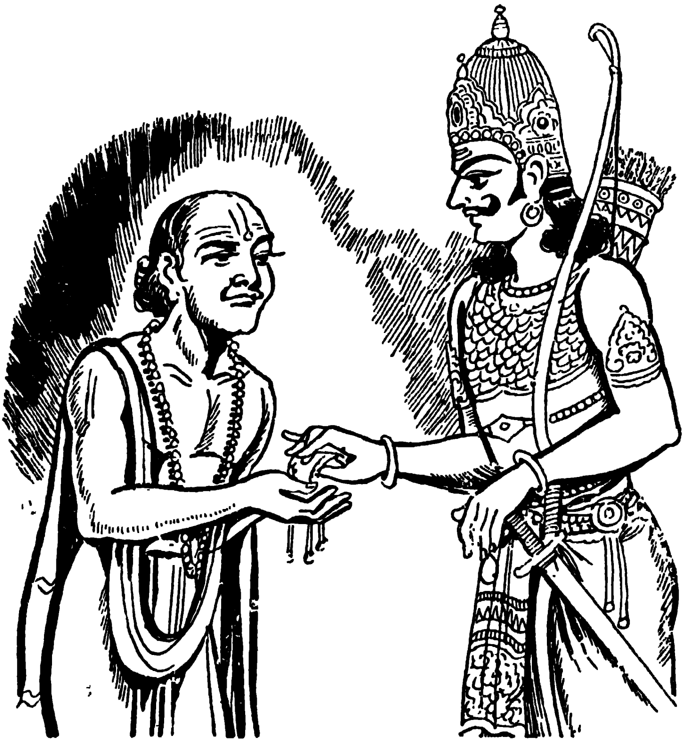
শঙ্খচূড় উত্তর দিলেন ঃ

'হ্যাঁ ব্রাহ্মণ, আমি প্রতিজ্ঞা করছি, আপনি যা চাইবেন, তাই দেবো।'

তখন আনন্দে ব্রাহ্মণবেশী নারায়ণ বললেন ঃ

'দৈত্যপতি, আপনার ঐ মোহন কবচ আমায় দান করুন। এটা পেলেই আমি আনন্দে বাড়ী ফিরে যাবো।'

দৈত্যপতি কথা দিয়েছিলেন। তিনি আপত্তি করলেন না, ব্রহ্মার প্রদত্ত কবচ তিনি আনন্দে ব্রাহ্মণের হাতে তুলে দিলেন।



নারায়ণ কবচ নিয়ে চলে গেলেন। তারপর ব্রাহ্মণের বেশ ছেড়ে শঙ্খচূড়ের রূপ ধারণ ক'রে গেলেন শঙ্খচূড়ের বাড়ীতে। দেবতারা দৈত্যসৈন্যের রূপ নিয়ে তাঁর পিছনে পিছনে চললেন।

তুলসী এত তাড়াতাড়ি স্বামীকে ফিরতে দেখে অবাক্ হ'য়ে যুদ্ধের খবর জিজ্ঞেস করলেন।

দৈত্যবেশী নারায়ণ বললেন ঃ

'শঙ্করের সঙ্গে সাংঘাতিক যুদ্ধ হ'লো। দেবসৈন্যগণ পরাজিত হ'লে শঙ্কর দেবতাদের রাজ্য ভিক্ষা চাইলেন। এদিকে ব্রহ্মাও স্বর্গরাজ্য দেবতাদের ফিরিয়ে দিতে আদেশ করলেন। আমি ব্রহ্মার আদেশ মেনে স্বর্গরাজ্য ফিরিয়ে দিলুম। মহাদেব তাঁর দেবসৈন্য নিয়ে লজ্জায় ফিরে গেলেন।'

শুনে তুলসী খুব আনন্দিত হলেন। তারপর স্বামীর সেবায় তৎপর হ'য়ে উঠলেন।

মধুমাস—বসন্তকাল ঃ চারদিকে কত ফুল ফুটে রয়েছে—কোকিলের প্রাণ-মাতানো গানে চারদিক মুখর হ'য়ে উঠেছে—চাঁদের জ্যোৎস্নায় যেন সারা আকাশে আলোর জোয়ার এসে গেছে।

তুলসীর মনও আনন্দে পূর্ণ। সুযোগ পেয়ে নারায়ণ শঙ্খচূড় দৈত্যের বেশে তুলসীকে ছলনা করলেন। তুলসী সঙ্গে সঙ্গেই টের পেলেন—এ তাঁর স্বামী নয়। তিনি তখনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ

'কে তুমি, সত্যি ক'রে বলো—নইলে শাপ দিয়ে তোমার সর্বনাশ করবো।'

সতীর শাপের ভয়ে নারায়ণ নিজের রূপ ধারণ করলেন।

তুলসী নারায়ণকে দেখে বললেন ঃ

'প্রভু, আপনার কি দয়া-মায়া নেই ? আমার স্বামীকে হত্যা করবার জন্য এরূপ ছলাকলার সুযোগ নিয়ে আমার সর্বনাশ করলেন। আপনার হৃদয় কি পাষাণে গড়া ? বেশ, তাই হোক্ —আপনি পাষাণ রূপই ধারণ করবেন। শালগ্রাম শিলারূপেই মানুষ আপনার পূজা করবে।'

নারায়ণ হেসে বললেন ঃ

'কেন তুমি দুঃখ করছো সতী! নরদেহ বর্জন ক'রে তুমি তো এখনি বৈকুণ্ঠে যাবে। তোমার দেহ গণ্ডকী নদীর রূপ পাবে, আর তোমার কেশ হবে তুলসীপত্র। আমার বরে তুলসীপত্র ছাড়া দেবতার পূজা-অর্চনা হবে না। তুলসীপত্র ভিন্ন শালগ্রামও কেউ কখন পূজা করতে পারবে না। আর আমিও থাকবো চিরকাল তোমারই কাছে—গণ্ডকীর জলে। শঙ্খ, শালগ্রাম আর তুলসী যে গৃহে, সেই গৃহ হবে বৈকুণ্ঠতুল্য।'

ওদিকে সেই মুহূর্তে দৈববাণী হ'লো ঃ

'মহাদেব, এইবার দৈত্যকে বধ কর। তার কাল পূর্ণ হয়েছে।'

সঙ্গে সঙ্গে মহাদেব নারায়ণের দেওয়া শূলের আঘাতে শঙ্খচূড়কে হত্যা করলেন। মৃত্যুর পর শঙ্খচূড় সুদামার রূপ ধরলেন। বৈকুণ্ঠ থেকে দিব্য রথ নেমে এলো—কৃষ্ণসখা সুদামা সেই রথে চড়ে বৈকুণ্ঠে চলে গেলেন।

আর এদিকে তুলসীও দিব্যদেহ ধারণ ক'রে নারায়ণের সঙ্গে রথে চড়ে চলে গেলেন বৈকুণ্ঠে।



কলাবতী

দৈত্যপতি শঙ্খচূড়—শঙ্খচূড়ের যোগ্য পুত্র সুচন্দ্র। পিতার মৃত্যুর পর সুচন্দ্র হলেন রাজা। ধনে জনে, ধর্মে কর্মে সুচন্দ্রের সমান কেউ নেই। যথাসময়ে সুচন্দ্র বিয়ে করলেন কলাবতীকে।

কলাবতী ব্রহ্মার মানসকন্যা—রূপেগুণে তাঁর তুলনা নেই, যেমন সুচন্দ্র, তেমনি কলাবতী—কেউ কারো চেয়ে কম নন, দুইই অতুলনীয়।

বিয়ের পর দু'জনেই মনের আনন্দে ঘুরে বেড়ান, কখন রথে চড়ে যান নদীর ধারে, কখন যান প্রমোদ-উদ্যানে, কখন বা দূর পাহাড়ে গিয়ে আনন্দ উপভোগ করেন। এই ভাবে আমোদ-আহ্লাদের মধ্যে তাঁদের কেটে গেল অনেক দিন।

ক্রমে সুচন্দ্র রাজার আমোদ-আহ্লাদে বিরক্তি ধরে গেল। সুন্দরী পত্নী কলাবতীকে ঘরে রেখে তিনি চলে গেলেন তপস্যায়।

পুলস্ত্যের আশ্রম, অতি পবিত্র স্থান—সুচন্দ্র সেই আশ্রমেই আশ্রয় নিয়ে তপস্যা আরম্ভ করলেন।

স্বামী সমস্ত সুখভোগ পরিত্যাগ ক'রে সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করছেন, এ অবস্থায় সতী সাধ্বী কলাবতীর মনে কি আর ভোগের ইচ্ছা থাকতে পারে? তিনি রাজ্য ছেড়ে এলেন পুলস্ত্যের আশ্রমের কাছে। আশ্রম থেকে একটু দূরে একটি কুটির নির্মাণ ক'রে সেখানেই তিনি থাকেন।

দিনের পর দিন যায়—সুচন্দ্র কঠোর তপস্যা করছেন। শেষটায় তিনি অনাহারে থেকেই তপস্যা করতে লাগলেন। ক্রমে তাঁর দেহ শীর্ণ হ'য়ে এলো—একদিন তপস্যা করতে করতেই হঠাৎ তিনি মূর্ছিত হ'য়ে পড়লেন।

দূর থেকে সুচন্দ্রকে এই ভাবে মূর্ছিত হ'য়ে পড়তে দেখে ছুটে এলেন সতী কলাবতী। তারপর স্বামীর অবস্থা দেখে চীৎকার ক'রে কাঁদতে লাগলেন, আর মনে মনে নারায়ণকে স্মরণ করতে লাগলেন।

সতীর এই করুণ ডাক শুনে ব্রহ্মার মনে খুব দুঃখ হ'লো। তিনি তাঁদের সামনে এসে হাজির হলেন, সুচন্দ্রের গায়ে হাত বুলো-লেন, তারপর কমণ্ডলু থেকে জল ছিটিয়ে দিলেন সুচন্দ্রের দেহে।

বিধাতার হাতের ছোঁয়া পেয়েই সুচন্দ্র রাজা উঠে বসলেন।

দেখলেন, সামনেই বসে আছেন স্বয়ং ব্রহ্মা। তিনি সাষ্টাঙ্গে ব্রহ্মাকে প্রণাম করলেন। সুচন্দ্রকে আশীর্বাদ ক'রে ব্রহ্মা বললেনঃ

'বৎস, তোমার তপস্যায় আমি খুবই প্রীত হয়েছি—কি বর চাও, বল।' ব্রহ্মার কথায় সুচন্দ্র রাজার মনে আর আনন্দ ধরে না। তিনি হাত জোড় ক'রে বললেনঃ

'প্রভু, বর দিতেই যদি আপনার ইচ্ছা হ'য়ে থাকে, তবে আমাকে মুক্তিদান করুন—আমার অন্য কোন বরে প্রয়োজন নেই।'

ব্রহ্মা বর দিতে উদ্যত হলেন।

কলাবতী প্রমাদ গুণলেন, তিনি ভাবলেন—ব্রহ্মা যদি বর দান করেন, তবে তাঁর স্বামী এখনই মৃত্যুবরণ করবেন।

তখন তিনি জোড় হাতে ব্রহ্মার কাছে নিবেদন করলেনঃ

'প্রভু, স্বামীই নারীর একমাত্র গতি, আপনি যদি স্বামীর প্রার্থনা পূরণ ক'রে তাঁকে মুক্তি দান করেন তবে আমার কি গতি হবে? স্বামী ছাড়া আমি কি ভাবে জীবন ধারণ করবো? —আমিও নিশ্চিত মৃত্যুবরণ করবো—আর আপনি নারীহত্যার পাতকী হবেন।'

কলাবতীকে সান্ত্বনা দিয়ে বিধাতা বললেনঃ

'কেন ভয় পাচ্ছো সতী, তোমাকে ছাড়া সুচন্দ্র কখনও মুক্তি পাবে না। তোমরা দু'জনেই কিছুকাল স্বর্গে গিয়ে থাক। তারপর আবার তোমরা দু'জনে মর্ত্যে জন্মগ্রহণ করবে। তখন তুমিই হবে রাধিকা-জননী।'

এই ব'লে ব্রহ্মা চলে গেলেন।

এর কিছুকাল পরেই সুচন্দ্র এবং কলাবতী প্রাণ বিসর্জন দিলেন।

*　　　*　　　*

গোকুলের রাজা সুরভানু, পদ্মাবতী তাঁর পত্নী। পদ্মাবতীর এক সন্তান হ'লো, নাম রাখা হ'লো বৃষভানু। এই বৃষভানুই হলেন সুচন্দ্র। কৃষ্ণের অংশে তাঁর জন্ম—পূর্বজন্মের কথাও মনে আছে। পিতার পর বৃষভানু রাজা হলেন—বড় হরিভক্ত রাজা। নন্দের সঙ্গে তাঁর খুবই বন্ধুত্ব। দু'জনে সহোদর ভাইয়ের মত—যেন দুই দেহ এক আত্মা। বৃষভানু মনের সুখে রাজত্ব করছেন।

এদিকে কান্যকুব্জরাজ ভলন্দরের মনে বড় দুঃখ—তাঁর কোন সন্তান নেই। পুত্রের জন্যে রাজা যজ্ঞ করবেন, স্থির করলেন।

কত মুনি-ঋষি এলেন—ভারে ভারে এলো যজ্ঞকাষ্ঠ, এলো প্রচুর ঘি আর যজ্ঞের উপকরণ।

শুভ দিন দেখে রাজা যজ্ঞ আরম্ভ করলেন। যজ্ঞশেষে যখন অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হ'লো, সেই মুহূর্তে যজ্ঞকুণ্ড থেকে বেরিয়ে এলো এক কন্যা। অপূর্ব সুন্দরী সেই কন্যা—তার ভুবন-ভুলানো রূপে সবার চোখ ঝল্‌সে গেল।

কন্যাকে দেখে রাজা ভলন্দর সাগ্রহে হাত বাড়িয়ে তাকে কোলে তুলে নিলেন।

রাণী সন্তানের অভাবে মনের দুঃখে ঘরে বসে ছিলেন। এমন সময় কন্যা কোলে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন রাজা ভলন্দর। রাজার কোলে অপূর্ব সুন্দরী কন্যাকে দেখে রাণী অবাক্ হ'য়ে



গেলেন। তারপর দু'হাতে সেই কন্যাকে কোলে তুলে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন :

'এ কার কন্যা—কোথায় পেলে ?'

তখন রাজা ধীরে ধীরে বললেন, কিভাবে যজ্ঞকুণ্ড থেকে এ কন্যার জন্ম হয়েছে। তারপর বললেন :

'একেই নিজের মেয়ের মত পালন কর। এই মেয়ে থেকেই আমাদের সন্তানের অভাব দূর হবে।'

রাণী কন্যাকে আদরযত্নে লালনপালন করতে লাগলেন। কন্যা বড় হ'লো। শুভ দিন দেখে তার অন্নপ্রাশন করা হ'লো।

সভামধ্যে যখন অতিথিরা উপস্থিত, তখন সহসা আকাশবাণী হ'লো ঃ 'কন্যার নাম রাখ কলাবতী।'

রাজা তাই কন্যার নাম রাখলেন কলাবতী। আমোদ-উৎসবে কয়দিন কেটে গেল।

কন্যা বড় হ'তে লাগলো। ক্রমে তার যৌবনকাল দেখা দিল। একদিন কলাবতী সেজেগুজে রাজপথে বেড়াতে বেরিয়েছেন, এমন সময় তাঁর সঙ্গে দেখা হ'লো নন্দরাজের। নন্দরাজা তীর্থভ্রমণে বেরিয়েছিলেন—পথে এই কন্যারত্ন দেখে থমকে দাঁড়ালেন। তারপর এক পথিককে কন্যার পরিচয় জিজ্ঞেস করলেন।

পথিক বলল ঃ

'ইনি কান্যকুব্জরাজ ভলন্দরের একমাত্র কন্যা কলাবতী। লক্ষ্মীর অংশে এই কন্যার জন্ম।'

পথিকের কথা শুনে আনন্দিত চিত্তে নন্দরাজ গেলেন ভলন্দররাজের গৃহে। নন্দরাজের পরিচয় পেয়ে ভলন্দর তাঁকে যথাযোগ্য সমাদর করলেন। তারপর ভলন্দর জানতে চাইলেন, নন্দের আগমনের কারণ।

নন্দ বললেন ঃ

'গোকুলের রাজা সুরভানু—তাঁর পুত্র বৃষভানু; রূপে

গুণে সে অদ্বিতীয়। আপনার কন্যা কলাবতীও অতুলনীয়া। বৃষভানুর হাতে কলাবতীকে দান করুন, অতি সুন্দর মিলন হবে দু'জনের। বৃষভানুর নারায়ণ-অংশে জন্ম—কলাবতীরও শুনেছি লক্ষ্মী-অংশে জন্ম—কাজেই এদের দু'জনের মিলনকে বিধির বিধান বলেই মেনে নেওয়া উচিত।'

নন্দের কথার উত্তরে ভলন্দর বললেন ঃ

'ভগবানের যা ইচ্ছা, তাই হবে। তিনি যার জন্যে এই কন্যা সৃষ্টি করেছেন, তার হাতেই কন্যা তুলে দেবো।'

খুশী হ'য়ে বললেন নন্দ ঃ

'সত্যি কথাই বলেছেন মহারাজ—কপালে যা আছে, তাই ঘটবে। তবে আমার কথাও শুনে রাখুন—বৃষভানুই এই কন্যার স্বামী হবে।'

তারপর দু'জনের মধ্যে অনেক কথাবার্তা আলাপ-আলোচনা হ'লো। পরিশেষে পরম আপ্যায়িত হ'য়ে নন্দরাজ ঘরে ফিরে এলেন। পরে সুরভানুর সঙ্গে দেখা ক'রে নন্দরাজ তাঁকে বললেন কলাবতীর কাহিনী। সব কথা শুনে সুরভানুও খুব আনন্দিত হলেন। তিনি গর্গ মুনিকে পাঠিয়ে দিলেন কান্যকুব্জে। মুনিবর ভলন্দরের সঙ্গে কথাবার্তা বলে বৃষভানুর সঙ্গে কলাবতীর বিবাহের দিন স্থির করলেন।

তারপর শুভ দিনে বৃষভানুর সঙ্গে কলাবতীর বিয়ে হ'য়ে গেল। তাঁদের জন্মজন্মান্তরের বন্ধন অক্ষুণ্ণ রইলো।



দুর্বাসার গৃহধর্ম

মুনির সেরা দুর্বাসা—যেমন তপস্বী, তেমনি বদরাগীও বটে। সারাজীবন জপে-তপেই কাটাচ্ছেন, কখন যদি লোকালয়ে গেছেন, তখনই হয়তো কাউকে শাপমন্যি ক'রে বসেছেন।

দুর্বাসা ঋষির দিন এইভাবেই কেটে যাচ্ছিল। তারপর যখন যৌবনকাল প্রায় গত, তখন হঠাৎ খেয়াল হ'লো তাঁর ঃ সংসারধর্ম তো করা হ'লো না! যেই এই কথা মনে হয়েছে, অমনি তিনি বিয়ের জন্যে অস্থির হ'য়ে কন্যার খোঁজে বেরিয়ে পড়লেন। কিন্তু এমনি বদরাগী ঋষির হাতে কে কন্যা তুলে দেবে? কাজেই খুঁজেই মরেন, কন্যা আর মেলে না!

ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছেন দুর্বাসা—অকস্মাৎ পথে দেখা হ'লো ঊর্বঋষির সঙ্গে। ঊর্বঋষি তাঁর সুন্দরী কন্যাকে নিয়ে যাচ্ছিলেন কোথাও—সেই সময় সাক্ষাৎ হ'লো।

ঊর্বঋষির সঙ্গে সুন্দরী কন্যা দেখে দুর্বাসা যেন হাতে চাঁদ পেলেন। ধীরে ধীরে ঊর্বঋষির কাছে গিয়ে দুর্বাসা মিষ্টভাষায় কথা বলতে লাগলেন। একথা সেকথার পর দুর্বাসা ঊর্বকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ

'মুনিবর, তোমার সঙ্গে এই অপূর্ব সুন্দরী কন্যাটি কে? বিজলীর মতো চোখ-ঝলসানো এর রূপ—দেখে ভারী আনন্দ হচ্ছে।—কার কন্যা, তোমার কাছেই বা কি ক'রে এলো, সব শুনতে ভারী কৌতূহল হচ্ছে।'

কন্যার প্রশংসায় উৎসাহিত হ'য়ে ঊর্ব বললেন ঃ

'এ আমারই কন্যা। বিজলীর মতো এর রূপ—এর সৌন্দর্যের তুলনা হয় না। বহু গুণই এর আছে কিন্তু কন্যার একটি মাত্র দোষ,—বড় কটুভাষিণী আর বড় কলহপরায়ণা; তাই এর নাম রেখেছি—কন্দলী।'

দুর্বাসা বললেন ঃ

'এখনও কি এর বিয়ে হয়নি?'

বিরক্ত হ'য়ে উত্তর দিলেন ঊর্ব ঃ

'কে বিয়ে করবে এই কুঁদুলী মেয়েকে? নিজের মেয়ে—ফেলেও দিতে পারি না; তাই সঙ্গে নিয়ে নিয়ে ঘুরতে হচ্ছে।'

কন্যার দিকে তাকিয়ে দুর্বাসা মুগ্ধ হ'য়ে গেলেন। মিষ্ট-ভাবে তিনি ঊর্বকে বললেন ঃ

'মুনিবর, সংসারে নারী-জাতিই যত দুঃখের কারণ। মায়াবিনীর মতো তারা পুরুষকে বশ করে। মানুষের ধর্ম-কর্ম সমস্ত লোপ পায় তাদেরই কারণে। কিন্তু তাহ'লেও আমার মন চঞ্চল হ'য়ে পড়েছে—ঘর-সংসার না করলেই আর নয়। তাই বিয়ে আমাকে করতেই হবে। দয়া ক'রে যদি তোমার কন্যাকে আমার হাতে দান কর, তবেই আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হ'তে পারে। আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, তোমার কন্যার যে-দোষই থাক না কেন তা' আমি মানিয়ে নিয়ে চলব, সে কলহ করলেও তাতে আমি কান দেবো না।'

কিন্তু দুর্বাসার কথায় ঊর্বমুনি খুব আশ্বস্ত হলেন ব'লে মনে হ'লো না। তখন দুর্বাসা আবার বলতে লাগলেন ঃ

'মুনিবর, তোমার সামনে আমি প্রতিজ্ঞা করছি, তুমি যা বলবে, আমি তাই শুনবো। তোমার কন্যাকে আমি কখনও পরিত্যাগ করবো না। যে নিজের পত্নীর উপর অত্যাচার করে, কিংবা তাকে কুকথা বলে, তার অপরাধের আর সীমা নেই। সে ইহকালে সমাজে নিন্দিত হয় এবং পরকালে নরকে গমন করে। আমা থেকে সে ভয় নেই। তুমি আমার হাতে তোমার কন্যাকে নিশ্চিন্তমনে অর্পণ কর।'

দুর্বাসার আগ্রহ দেখে এবং তাঁর কথা শুনে ঊর্বমুনি শেষ

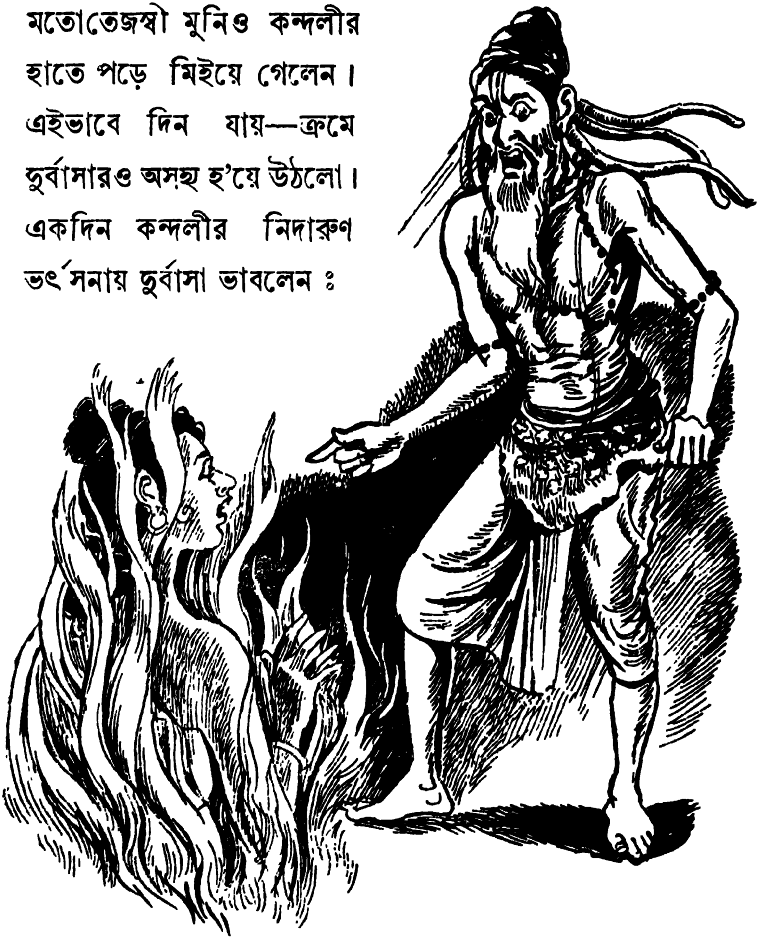
পর্যন্ত তাঁর হাতে কন্যা দিতে রাজী হলেন। বিধিমতে দুর্বাসার সঙ্গে কন্দলীর বিয়ে হ'য়ে গেল। ঊর্বমুনি কন্যাদান করলেন, যথাসাধ্য যৌতুকও দিলেন। পিতাপুত্রীর বিচ্ছেদের কালে দু'জনেই দুঃখিত হলেন। এতকাল পিতার নিকট থেকে এক্ষণে তাঁকে ছেড়ে যেতে হবে—এই দুঃখে কন্দলীও কাতর হ'য়ে পড়লো। যাবার বেলা ঊর্বমুনি কন্যাকে স্বামিভক্তি সম্বন্ধে অনেক উপদেশ দিয়ে গেলেন। স্বামীকে অবহেলা করা, স্বামীর অবাধ্য হওয়া কিংবা স্বামীকে কটুকথা বলা যে সতী নারীর পক্ষে কর্তব্য নহে, এই কথাই মুনি কন্যাকে বার বার বুঝিয়ে বললেন। তারপর বর-বধূকে আশীর্বাদ ক'রে ঊর্বমুনি তীর্থভ্রমণে বেরিয়ে পড়লেন।

এতদিনে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হওয়ায় বিশেষতঃ কন্দলীর মতো সুন্দরী স্ত্রী লাভ করায় দুর্বাসা খুবই আনন্দিত হলেন। তিনি ঘর-সংসার করবার উদ্দেশ্যে বনের মধ্যে সুন্দর এক পুরী নির্মাণ করলেন। তারপর সেখানেই দু'জনে থাকতে লাগলেন।

দিন যায়—মনের আনন্দেই তাঁরা আছেন। নববিবাহিত দম্পতি আমোদ-আহ্লাদেই দিন কাটিয়ে দেন। এদিকে দুর্বাসা মুনির জপ-তপ, পূজা-অর্চনা সমস্ত বাদ পড়লো—সেদিকে তাঁর আর কোন দৃষ্টিই নেই। তিনি কন্দলীকে নিয়েই মত্ত রইলেন।

কন্দলী কিন্তু নিজের স্বভাব ছাড়তে পারেনি। সে অকারণেই স্বামীকে কটুকথা বলে। মুনি মিষ্টভাষায়

তাকে প্রবোধ দেন—কিন্তু কে শোনে কার কথা? দুর্বাসার মতোতেজস্বী মুনিও কন্দলীর হাতে পড়ে মিইয়ে গেলেন। এইভাবে দিন যায়—ক্রমে দুর্বাসারও অসহ্য হ'য়ে উঠলো। একদিন কন্দলীর নিদারুণ ভৎ´সনায় দুর্বাসা ভাবলেন ঃ



দুর্বাসার রুদ্র দৃষ্টিতে কন্দলী পুড়ে ছাই হ'য়ে গেল। [৪৫ পৃষ্ঠা]

'এ কি বিপদে পড়লাম! না বুঝে যেমন কাজ করেছিলাম,

এখন তারই উচিত শাস্তি পাচ্ছি। নারীর জন্যই আমার ধর্ম-কর্ম, জপ-তপ, কৃষ্ণসেবা সব গেল, এখন তো চোখের জলে দিন যায়।'

ভাবতে ভাবতে দুর্বাসা ক্রুদ্ধ হ'য়ে উঠলেন। তাঁর চোখ লাল হ'য়ে গেল, সমস্ত গা কাঁপতে লাগলো।

কন্দলীর দিকে তিনি ক্রোধভরে তাকালেন। দুর্বাসার সেই রুদ্র দৃষ্টিতে কন্দলী পুড়ে ছাই হ'য়ে গেল।

এমন সময় দুর্বাসা শুনতে পেলেন, আকাশ থেকে কে যেন বলছে ঃ 'স্বামী, তুমি আমাকে ভস্ম করলে—তাতে আমার কোন দুঃখ নেই। কারণ মানুষ কর্মফল খণ্ডাতে পারে না—কাজেই তোমারও কোন দোষ নেই। কিন্তু পরজন্মে আমি কোথায়, কি ভাবে জন্মগ্রহণ করবো, সে কথাটা আমায় বলে দাও। পরজন্মেও তোমাকেই আমি স্বামিরূপে পেতে চাই। তুমি আমাকে ত্যাগ করলেও আমি তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারব না।'

অলক্ষ্যে কন্দলীর কথা শুনে দুর্বাসার মনে বড় অনুতাপ হ'লো। তিনি ভাবলেন ঃ

'কেন ক্রোধবশে তাকে ভস্ম করলাম! নিজের দোষে আমি এমন সুন্দরী স্ত্রীরত্নকে হারালেম, এখন তাকে হারিয়ে আমি কি ক'রে বাঁচবো ?' এই বলে কাঁদতে কাঁদতে দুর্বাসা ভাবলেন ঃ

'আমিও আত্মবিসর্জন করবো।'

এই ভেবে তিনি যোগাসনে বসে নিশ্বাস রোধ ক'রে যখন প্রাণত্যাগে উদ্যত হলেন, সেই মুহূর্তে ভগবান্ এক ব্রাহ্মণকুমারের বেশে তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালেন।



রক্তবস্ত্র-পরিহিত সুন্দর সুঠাম দেহ—সেই বালক-মূর্তিকে দেখে দুর্বাসা খুব খুশী হ'য়ে তাকে বসবার আসন দিলেন। খুব অবাক হয়ে সেই বালকের দিকে তাকিয়ে রইলেন দুর্বাসা—শোকতাপ সব কিছু ভুলে গিয়ে।

ব্রাহ্মণকুমারবেশী জনার্দন বললেন ঃ

'তুমি তো মুনিশ্রেষ্ঠ—সামান্য নারীর জন্য এত কাতর হওয়া কি তোমার শোভা পায়? নারী যত বিপদের মূল—তার জন্যে দুঃখ ক'রে কি করবে? পৃথিবীতে স্ত্রী, পুত্র, ভাই, বোন কেউ কিছু নয়। জগতের কোন কিছুই চিরস্থায়ী নয়। বৃথা চিন্তা ত্যাগ ক'রে কৃষ্ণসেবায় মন দাও।'

দুর্বাসাকে নীরব দেখে সেই ব্রাহ্মণ আরও বললেন ঃ

'যদি একান্তই তোমার গৃহধর্মে আসক্তি জন্মে থাকে, তবে তুমি ব্রজধামে চলে যাও, সেখানে বসুদেবের কন্যা আছেন—হৈমবতীর অংশে তাঁর জন্ম—তাঁকে বিয়ে ক'রে তুমি সুখী হও। কন্দলীর জন্য দুঃখ করো না—পরজন্মে আবার তাকে পাবে।'

এই বলে ব্রাহ্মণবেশী জনার্দন অদৃশ্য হ'য়ে গেলেন।

দুর্বাসা প্রাণ বিসর্জনের সংকল্প ত্যাগ ক'রে যোগাসন ছেড়ে উঠে পড়লেন।

কিছুদিন পর দুর্বাসামুনি গিয়ে পৌঁছুলেন ব্রজধামে। কৃষ্ণ তাঁকে দেখেই বুঝতে পারলেন যে তাঁর ভগ্নীর এই হ'লো যোগ্য বর।

হৈমবতীর অংশভূতা সেই কন্যা সম্পর্কে কৃষ্ণের ভগ্নী ছিলেন। তাঁরও পিতা নন্দরাজ এবং মাতা যশোদা। জন্মের পর বসুদেব তাঁকে নিয়ে আসেন নিজের পুরীতে—সেই থেকে তিনি বসুদেবের কন্যারূপেই সকলের কাছে পরিচিতা ছিলেন।

কৃষ্ণ তাঁর ভগ্নীকে দুর্বাসার হাতে সমর্পণ করলেন। নব-পরিণীতা পত্নীর সঙ্গে সুখেই দুর্বাসার দিন কাটে। তারপর একদিন কৃষ্ণের মুখে তত্ত্বকথা শুনে দুর্বাসার মন আবার বিগড়ে গেল। তিনি ভাবলেন—না, আর সংসার-ধর্ম নয়।

এই ভেবে পত্নীকে সেখানে রেখেই তিনি বেরিয়ে পড়লেন তীর্থপর্যটনে। নানা তীর্থ ঘুরে তিনি গিয়ে পৌঁছুলেন কৈলাসে। সেখানে মহাদেবীর সঙ্গে দেখা ক'রে বললেন তাঁর নিজের কাহিনী।

মহাদেবী তখন তাঁকে ভৎর্সনা ক'রে বললেন ঃ

'প্রকৃতির হাতে বিশ্বজগতের সৃষ্টি। সেই প্রকৃতিকে তুমি অবহেলা করছ? তা'ছাড়া এখনও



তুমি অপুত্রক—তোমার তো সমস্ত পুণ্যফল বিনষ্ট হবে। তুমি আবার সংসারে ফিরে যাও—সংসার-ধর্ম কর।'

দুর্বাসা আর কি করেন! তিনি ফিরে এলেন। তারপর সংসার-ধর্ম করতে লাগলেন।



বহুকাল আগে বৃক্ষ নামে এক দৈত্যরাজ ছিলেন—তিনি ছিলেন একান্ত শিবভক্ত। সর্বক্ষণ মুখে শিবনাম উচ্চারণ করেন, মনে মনেও শিবের নামই জপ করেন।

একসময়ে দৈত্যরাজ গেলেন কেদারধামে। সেখানে এক নির্জন পর্বত-গুহায় অনাহারে থেকে দারুণ তপস্যা আরম্ভ করলেন তিনি। তপস্যা ক'রে ক'রে তাঁর অস্থিচর্মসার হ'লো। তখন মহাদেব তুষ্ট হ'য়ে রাজাকে দেখা দিলেন এবং বললেন ঃ

'রাজা, তোমার যোগ ত্যাগ কর। আমি তোমার তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়েছি—এখন বর প্রার্থনা কর। তোমার যা' ইচ্ছা বল, আমি তা' পূর্ণ করবো।'

কিন্তু রাজার তপস্যাও ভাঙ্গে না, কোন বরও তিনি চান না। মহাদেব বারবার বলছেন ঃ

'বর প্রার্থনা কর।'

কিন্তু বৃক্ষ রাজা অনড়, অচল। তিনি ধ্যান করেই চলছেন।

তখন মহাদেব মনে মনে ভাবলেন ঃ

'এত ক'রে বলছি—তবু বর চাইছে না কেন?'

অথচ ভক্তকে বর না দিয়ে তিনি চ'লে যেতেও পারেন না। কতক্ষণ চুপ ক'রে থেকে হঠাৎ মহাদেব চীৎকার ক'রে উঠলেন। সেই চীৎকারের শব্দে দৈত্যরাজের চেতনা হ'লো। সামনে তাকিয়ে দেখতে পেলেন—তাঁর আরাধ্য দেবতা মহাদেব দাঁড়িয়ে আছেন। দৈত্যরাজ সাষ্টাঙ্গে মহাদেবকে প্রণাম করলেন। তারপর করজোড়ে স্তুতি করতে লাগলেন।

তাঁর স্তবস্তুতি শেষ হ'লে পর মহাদেব বললেন ঃ

'দৈত্যপতি, তোমার তপস্যায় খুশী হয়েছি, বর প্রার্থনা কর।'

তখন বৃক্ষ রাজা বললেন ঃ

'প্রভু, যদি বরদান করবে, তবে এই বর দাও, আমি যার মাথায় হাত দেব, সে-ই যেন সঙ্গে সঙ্গে ভস্ম হ'য়ে যায়।—অন্য কোন বর আমি চাই না।'

মহাদেব ভালমন্দ না ভেবেই বললেন ঃ

'বেশ, তাই হবে। তুমি যার মাথায় হাত দেবে, সেই ভস্ম হয়ে যাবে।'

বর পেয়ে বৃক্ষ রাজা খুব খুশী হলেন। কিন্তু মনে মনে ভাবলেন মহাদেব হয়তো তাঁর সঙ্গে ছলনা করেছেন। তাই বললেন ঃ

'প্রভু, যে বর দিলেন, তাতে কাজ হয় কিনা তা' আপনার উপর দিয়েই পরীক্ষা করতে চাই। আপনার মাথায়ই হাত দেব।'

রাজার কথা শুনে মহাদেবের তো চক্ষু স্থির! তিনি প্রাণ বাঁচাবার জন্য ছুটতে শুরু করলেন। কিন্তু বৃক্ষ রাজাও ছাড়লেন না। তিনি মহাদেবের পেছন পেছন ছুটতে লাগলেন।

মহাদেব নিরুপায় হ'য়ে নারায়ণের শরণ নিলেন।

নারায়ণকে সব কথা খুলে বলতে বলতে বৃক্ষ রাজা সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন। নারায়ণ তখন রাজাকে বললেন ঃ

'বৃক্ষ, তুমি এমন বেশে ছুটে আসছ কেন? তোমার মাথায় ও-সব কি? কোথায় ছিলে এতক্ষণ?'

বৃক্ষের তখন দিগ্‌বিদিক জ্ঞান নেই। নারায়ণের কথায় হতভম্ব হ'য়ে তাঁর মাথায় কি তা' দেখবার জন্যে যে-ই নিজের মাথায় হাত দিলেন অমনি তিনি ভস্মীভূত হ'য়ে গেলেন।

মহাদেব নিস্তার পেলেন।



বলি-বামন কাহিনী

আদি দৈত্য হিরণ্যকশিপু, আর হিরণ্যকশিপুর পুত্র প্রহ্লাদ। দৈত্যবংশে জন্ম নিলেও প্রহ্লাদ ছিলেন শ্রেষ্ঠ বিষ্ণু-ভক্ত। প্রহ্লাদের পুত্র বিরোচন—তাঁর বিক্রমে দেবতারা পর্যন্ত ভয়ে থরহরি কম্পমান। ইন্দ্র ব্রাহ্মণরূপে এসে তাঁকে ছলনা করলেন; আর ব্রাহ্মণের জন্য বিরোচন নিজের প্রাণ বিসর্জন দিলেন।

সেই বিরোচনের পুত্র বলি—মহাবলী বলি। তাঁর প্রতাপে স্বর্গের দেবতারাও অস্থির হ'য়ে উঠলেন।

বলি যুদ্ধ ক'রে মর্ত্যভূমি জয় করলেন। তারপর দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের নিকট শুনলেন যে, দেবরাজ ইন্দ্র ছলনা ক'রে তাঁর পিতা বিরোচনের প্রাণ হরণ করেছেন। এই কথা শুনেই তিনি

পিতৃহত্যার প্রতিশোধের জন্যে উঠে পড়ে লাগলেন। তিনি স্থির করলেন, ইন্দ্রপুরী দখল করবেন।

দৈত্যপুরীতে 'সাজ সাজ' রব পড়ে গেল। বলি অসংখ্য সৈন্য নিয়ে উপস্থিত হলেন স্বর্গরাজ্যে ইন্দ্রপুরীতে। যুদ্ধের বাজনায় স্বর্গের আকাশ পূর্ণ হ'য়ে সমস্ত স্বর্গে তা ছড়িয়ে পড়লো। দেবতারাও আত্মরক্ষার জন্যে তৈরী হ'য়ে এলেন।

দুই পক্ষে প্রচণ্ড যুদ্ধ আরম্ভ হ'লো। দুদিকেই আছে রথী মহারথীর দল। তাঁরা একে অপরের দিকে যত সব সাংঘাতিক অস্ত্র ছুঁড়তে লাগলেন।

দেবতা-অসুরে তো যুদ্ধ চলেছে—কেউ আর হারছে না। যুদ্ধের কাণ্ডকারখানা দেখে মনে হয় যেন প্রলয়কাল এসে গেছে। দুপক্ষেই বাণে বাণে একেবারে ছয়লাপ—আর বাণের নামই বা কত—রুদ্রবাণ, পাশুপত, ইন্দ্রজাল, ব্রহ্মজাল, শিলীমুখ, সূচীমুখ, রুদ্রমুখ—এমনি আরও কত কি!

অনেকক্ষণ যুদ্ধের পরও যখন দেবতারা দৈত্যদের পরাস্ত করতে পারলেন না, তখন ইন্দ্র সাংঘাতিক চটে গিয়ে নিজেই নামলেন যুদ্ধে। বলির সঙ্গে ইন্দ্রের যুদ্ধ সুরু হ'লো। ইন্দ্র যত বাণ ছোঁড়েন, বলি সেই সব বাণকে কেটে খণ্ড খণ্ড ক'রে ফেলেন। তারপর বলির এক বাণে ইন্দ্র মূর্ছিত হ'য়ে পড়লেন।

ইন্দ্রকে মূর্ছিত দেখে তাঁর সারথি মাতলি রথ ঘুরিয়ে নিয়ে গেলেন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে অনেক দূরে এক নদীর ধারে। এদিকে

কিছুক্ষণ নদীতীরের শীতল বাতাসে থাকবার পর যখন ইন্দ্রের চেতনা হ'লো, তখন তিনি মাতলিকে বললেন ঃ

'ছিঃ ছিঃ, সম্মুখ সংগ্রাম থেকে তুমি রথ নিয়ে পালিয়ে এলে। দেখছি, দেবতা আর দৈত্যের সমাজে তো আর মুখ দেখানো যাবে না !'

মাতলি সবিনয়ে বললেন ঃ

'রথী মূর্ছিত হ'য়ে পড়লে সারথির পক্ষে রথ পিছিয়ে আনা তো যুদ্ধনীতি-সম্মতই, তাতে দোষ কি ?'

কিন্তু ইন্দ্র তা মানতে রাজী নন। তিনি মাতলিকে বললেন ঃ

'শীঘ্র যুদ্ধক্ষেত্রে চলো। আজ বলিকে শমনভবনে পাঠিয়ে তবে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করবো।'

মাতলি আবার যুদ্ধক্ষেত্রে চললেন। রথের ঘর্ঘর শব্দে আকাশ-বাতাস কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগলো।

এবার ইন্দ্র ছুঁড়লেন তাঁর মহা অস্ত্র—বজ্র।

বজ্রের আঘাতে বলির মুকুট, কুণ্ডল কাটা গেল, রথ ভাঙ্গলো, আর রক্তাক্ত দেহে বলি নিজেও মূর্ছিত হ'য়ে লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে।

দৈত্যসৈন্যদের মধ্যে হাহাকার পড়ে গেল। তারা ছুটে পালালো যুদ্ধক্ষেত্র থেকে। আর কতক দৈত্য বলিকে কাঁধে নিয়ে চলে এলো দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের আশ্রমে।

মন্ত্রবলে শুক্রাচার্য বলির প্রাণদান করলেন। বলি সুস্থ হ'য়ে গুরুর আরাধনা করলেন। গুরু তুষ্ট হ'য়ে বলিকে মহামন্ত্র দান করলেন। বলি মহামন্ত্র পেয়ে ভাবলেন—এবার ত্রিভুবন-জয়ী হবো।

এই ভেবে বলি চলে গেলেন হিমালয়ে—সেখানে তিনি রত হলেন কঠোর তপস্যায়। দীর্ঘকাল তপস্যা করবার পর তুষ্ট হ'য়ে ব্রহ্মা এলেন বর দিতে। তিনি বলিকে বললেন ঃ

'তোমার তপস্যা সিদ্ধ হয়েছে। এখন বর প্রার্থনা কর। আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি—তুমি যে বরই চাইবে আমি তাই দেবো তোমাকে।'

ব্রহ্মার প্রতিশ্রুতি পেয়ে বলি চাইলেন একেবারে মোক্ষম বর ঃ

'প্রভু যদি বর দিতে চান, তবে এমন বর দিন, যাতে আমি অজেয় এবং অমর হ'তে পারি। কেউ যেন আমাকে পরাজিত করতে না পারে, এবং কারো হাতে যেন আমার মৃত্যু না হয়।'

ব্রহ্মা বলিকে সেই বরই দিয়ে স্বর্গধামে চলে গেলেন।

এইবার মহাবলে বলীয়ান হ'য়ে বলি ফিরে এলেন নিজের রাজ্যে। তারপর সৈন্য সংগ্রহ ক'রে যুদ্ধের আয়োজন করতে লাগলেন। আয়োজন সম্পূর্ণ হ'লে তিনি সসৈন্যে স্বর্গ আক্রমণ করলেন।

আবার দেব-দৈত্যে ভীষণ যুদ্ধ সুরু হ'লো। বহুদিন ধরে চললো

যুদ্ধ, শেষ পর্যন্ত যুদ্ধে দেব-সৈন্য পরাজিত হ'লো। পবন, শমন, বরুণ, তপন থেকে আরম্ভ ক'রে ইন্দ্র পর্যন্ত পালিয়ে রক্ষা পেলেন। স্বর্গরাজ্য দেবতাদের হাতছাড়া হ'য়ে গেলো।

দৈত্যরাই এবার স্বর্গরাজ্যের সমস্ত কাজ হাতে নিলে। আর দেবতারা মানুষের বেশে পৃথিবীতে চলে এলেন।

এইবার দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য বলিকে পরামর্শ দিলেন ঃ

'এখন তুমি শত অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করো। তাহলেই তোমার সর্ব কর্ম সার্থক হবে।'

মহা তোড়জোড় ক'রে বলি শত অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করলেন।

ওদিকে দেবমাতা অদিতি ভাবতে লাগলেন ঃ তাঁর পুত্রগণ স্বর্গ থেকে বঞ্চিত হয়েছে, এখন কি ক'রে তাদের পুনরায় স্বর্গরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করা যায়।

দেবতারা বড় মনঃকষ্টে আছেন পৃথিবীতে। তাঁরাও ভাবছেন, দৈত্যের দর্প ভঙ্গ হয় কিসে! তাঁরা আবার কিরূপে দৈত্যদের পরাজিত ক'রে স্বর্গভূমিতে ফিরে যেতে পারেন।

দেবমাতা অদিতি আরম্ভ করলেন তপস্যা। সে কি কঠোর তপস্যা! প্রথম দিকে তিনি বায়ু সেবন করতেন, পরে তাও বর্জন করলেন। সম্পূর্ণ অনশনে তাঁর দিন কাটতে লাগলো।

দিনে দিনে তাঁর তপস্যা কঠোরতর হ'য়ে উঠতে লাগলো। দেখে চিন্তিত হলেন ব্রহ্মা। তিনি দেবতাদের ডেকে বললেন :

'তোমরা দেবমাতা অদিতির তপস্যা একটু পরীক্ষা ক'রে এসো।'

পিতামহ ব্রহ্মার আদেশে ইন্দ্র দেবতাদের সঙ্গে নিয়ে গেলেন অদিতির কাছে। অদিতি তপোমগ্ন। তাঁর সামনে দেবতারা সব হাতজোড় ক'রে বসলেন ; ইন্দ্র তাঁদের মুখপাত্র-রূপে বললেন :

'মা, তুমি বৃথা এত কষ্ট ভোগ করছো। সবাই কর্মফলের অধীন—কর্মফলেই আমরা স্বর্গচ্যুত হয়েছি। আবার কর্মফল খণ্ডন হলেই আমরা স্বর্গ ফিরে পাব। মাঝখান থেকে তুমি অনর্থক নিজের আত্মাকে কষ্ট দিচ্ছ। কথায় বলে—আত্মা রেখে ধর্ম। এই কঠোর তপস্যার কষ্ট তুমি আর সহ্য করতে পারবে না, তপস্যা ত্যাগ কর। আমরা শক্তি সঞ্চয় ক'রে আবার স্বর্গ আক্রমণ করবো।'

ইন্দ্রের কথায় অদিতির তপস্যা ভঙ্গ হ'লো। তিনি রোষ-দৃষ্টিতে তাকালেন দেবতাদের দিকে। দেবতারা সব ভয় পেয়ে পালিয়ে এলেন অদিতির সামনে থেকে।

তারপর তাঁরা সব গেলেন ব্রহ্মার কাছে, গিয়ে বললেন সব কাহিনী। ব্রহ্মা খুব চিন্তিত হলেন। কারণ তিনি ভালরকমই জানেন যে, দৈত্যপতি বলিকে পরাজিত করবার সাধ্য দেবতাদের

নেই। এখন একমাত্র উপায় অগতির গতি নারায়ণের শরণাপন্ন হওয়া।

অতঃপর ব্রহ্মা দেবতাদের সঙ্গে নিয়ে গেলেন ক্ষীরোদ-সাগরের তীরে,—যেখানে নারায়ণ ধ্যানস্থ হ'য়ে আছেন। দেবতারা সমবেতভাবে স্তবস্তুতি করতে লাগলেন নারায়ণের। নারায়ণ সন্তুষ্ট হ'য়ে দেবতাদের বললেন ঃ

'শীঘ্র তোমাদের দুঃখ মোচন হবে—তোমরা ফিরে যাও।'

দেবতারা সন্তুষ্ট চিত্তে ফিরে এলেন।

এদিকে দেবতারা চলে গেলে পর অদিতি আবার চক্ষু মুদ্রিত ক'রে তপস্যায় মগ্ন হলেন। ধীরে ধীরে তাঁর সামনে ভেসে উঠলো নব-জলধরশ্যাম নারায়ণ মূর্তি। তাকালেন অদিতি—তারপর সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন জগৎপতি নারায়ণকে। তারপর নানাভাবে স্তবস্তুতি করলেন নারায়ণের। বললেন ঃ

'প্রভু, তুমিই অগতির গতি—সর্ব বিপদ্ থেকে আমাদের রক্ষা কর।'

নারায়ণ তখন সন্তুষ্ট হ'য়ে বললেন ঃ

'দেবমাতা, কি তোমার ইচ্ছা, নির্ভয়ে বল। যত অসাধ্যই হোক না কেন, আমি তোমার প্রার্থনা পূরণ করবো।'

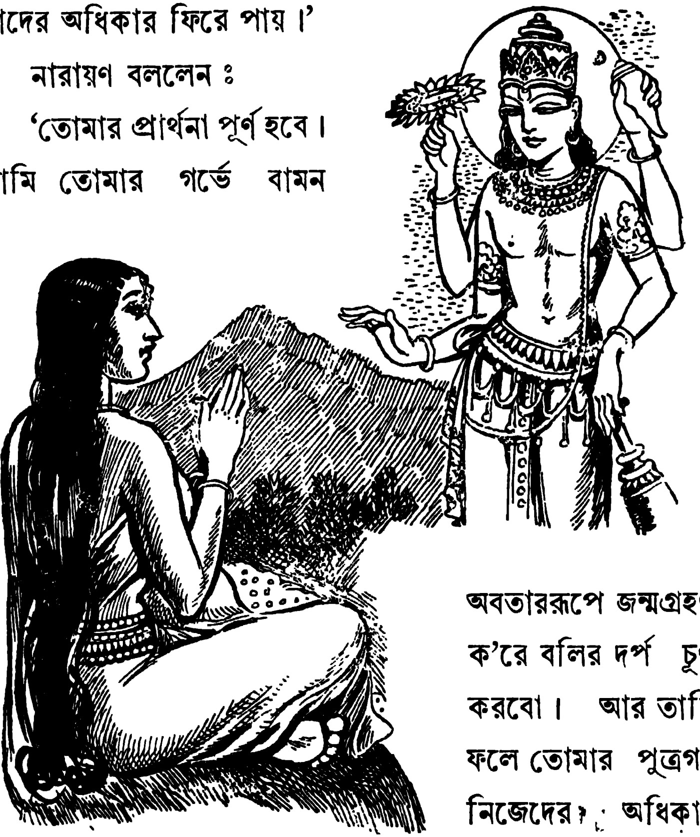
তখন অদিতি বললেন ঃ

'প্রভু, আপনি আমার পুত্রদের বিপদ্ থেকে বাঁচান।

আমি তাদের কষ্ট আর দেখতে পারি না। তারা স্বর্গ থেকে বিতাড়িত হ'য়ে মানুষের বেশে পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর দৈত্যরা স্বর্গ ভোগ করছে। আপনি এমন ব্যবস্থা করুন, যাতে আমার পুত্রেরা তাদের অধিকার ফিরে পায়।'

নারায়ণ বললেন ঃ

'তোমার প্রার্থনা পূর্ণ হবে। আমি তোমার গর্ভে বামন



অবতাররূপে জন্মগ্রহণ ক'রে বলির দর্প চূর্ণ করবো। আর তারি ফলে তোমার পুত্রগণ নিজেদের অধিকার ফিরে পাবে। বলির কবল থেকে স্বর্গরাজ্য ফিরে পেতে হ'লে এ ছাড়া আর কোন উপায় নেই।'

অবাক্ হ'য়ে অদিতি বললেন ঃ

'এ কি উপহাস করছেন প্রভু! অখিল ব্রহ্মাণ্ড যাঁর রোমকূপে স্থান পায়, তাঁকে আমি গর্ভে ধারণ করবো কীভাবে? যোগীরা ধ্যান করেও যাঁর তত্ত্ব বুঝতে পারে না, তিনি আমার কোলে আসবেন!'

মৃদু হেসে নারায়ণ বললেন ঃ

'না, না, উপহাস নয়। আমি ভক্তির অধীন—তোমার ভক্তিতে তুমি আমাকে বশ করেছ, তাই তোমার গর্ভেই আমি জন্ম নেব। তুমি চিন্তা করো না দেবমাতা—এখন নিজের ঘরে ফিরে যাও।'

অদিতিকে এ কথা বলে নারায়ণ স্বস্থানে চলে গেলেন, আর দেবমাতা ফিরে এলেন আপন গৃহে।

অদিতি সমস্ত কাহিনী খুলে বললেন তাঁর স্বামী কশ্যপ-মুনিকে। মুনি সে কথা শুনে আনন্দে অধীর হ'য়ে উঠলেন। তাঁর ঘরে দেবতা জন্ম নেবেন—এ কথা স্বপ্নেও যে ভাবা যায় না।

কিছুদিন পর অদিতির সন্তান হবার সময় হ'লো ; তাঁর দেহের আভায় কশ্যপ বুঝতে পারলেন, নারায়ণ সত্যি তাঁরি ঘরে আবির্ভূত হবেন। তিনি এই ভেবে নারায়ণের স্তব করতে লাগলেন।

যথাসময়ে অদিতির এক পুত্রসন্তান হ'লো। বামন-মূর্তি সে সন্তান। জন্মমাত্রই পিতাকে বললেন ঃ

'পিতা, এখনি আমার ব্রাহ্মণ-সংস্কার করুন আমার উপনয়ন দিন।'

শুভক্ষণ দেখে কশ্যপ-মুনি বামনের উপনয়ন দিলেন। তখন বামন বললেন ঃ



'বিরোচন-পুত্র বলি মহাযজ্ঞ করছেন। আমি সেখানে দান গ্রহণ করতে যাবো।'

এই বলে বামন যাত্রা করলেন বলিধামে। তিনি যজ্ঞস্থলের দ্বারদেশে উপনীত হ'তেই দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য বলিকে ডেকে সাবধান ক'রে দিলেন ঃ

'নারায়ণ ছদ্মবেশে বামনের রূপ ধরে তোমায় ছলনা করতে এসেছেন। খবরদার, তাঁকে যেন কোন কিছু দান করো না।'

অবাক্ হ'য়ে বলি বললেন ঃ

'এ কি বলছেন গুরুদেব ? যে নারায়ণের এককণা প্রসাদের জন্য যজ্ঞ করছি, সেই নারায়ণ যদি স্বেচ্ছায় আমার যজ্ঞস্থলে আগমন করেন, তবে আমি যে যথাসর্বস্বও দান করতে প্রস্তুত আছি !'

বলির মূর্খতায় বিরক্ত হ'য়ে শুক্রাচার্য তাঁকে অভিশাপ দিয়ে বললেন ঃ



'এই অপরাধে তুমি লক্ষ্মীহীন হবে।'

'আমার বাক্য তুমি অবহেলা করলে, এই অপরাধে তুমি লক্ষ্মীহীন হবে।'

এই বলে দৈত্যগুরু চলে গেলেন, আর বামন এসে যজ্ঞস্থলে উপনীত হলেন। বামনের আকৃতি আর দীপ্তি দেখে সবাই বিস্মিত হ'লো। বলি তাঁকে পাদ্য অর্ঘ্য দান করলেন এবং

নানাভাবে স্তবস্তুতি করলেন। যজ্ঞ করা এবং নিজের জীবন সার্থক হয়েছে বিবেচনা ক'রে বললেনঃ

'কি আপনার প্রার্থনা, বলুন প্রভু!'

কপট হাসি হেসে বামন বললেনঃ

'ধনে জনে, কোন কিছুতেই আমার প্রয়োজন নেই—আমি ব্রাহ্মণ বালক। তপস্যাই আমার একমাত্র কাজ। যদি দান দিতেই হয় তবে আমাকে তিন পদ জায়গা মাত্র মেপে দাও—যেখানে বসে আমি তপস্যা করতে পারি। ত্রিপাদ মাত্র ভূমি আমায় দান কর দৈত্যরাজ।'

মাত্র ত্রিপাদ ভূমি দান! বলির এতে মন ওঠে না। তিনি বললেনঃ

'যদি মাত্র তিন পাদ ভূমি দান করি, তবে লোকে আমার কলঙ্ক রটনা করবে। আপনি আর কিছু প্রার্থনা করুন ব্রাহ্মণ—গ্রাম, নগর, রাজ্য, যা খুশী।'

বামন হেসে বললেনঃ

'যা চেয়েছি তার বেশী কিছু আমি চাই না। ত্রিপাদ মাত্র ভূমিতেই আমি তৃপ্ত হবো।'

দৈত্যরাজ বলি গাড়ু হাতে নিয়ে যখন হাতে জল ঢালবেন, তখন দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য চিন্তা করলেন—এবার বুঝি বলির সর্বনাশ হ'লো। এই ভেবে তিনি তাড়াতাড়ি ছোট একটি বজ্রকীটের বেশে গাড়ুর মধ্যে ঢুকে নলের মুখ আটকে রাখলেন।

এদিকে দৈত্যপতি দান করবেন, কিন্তু গাড়ু থেকে জল আর পড়ে না। দৈত্যপতি ভয়ানক লজ্জায় পড়ে গেলেন।

বামনবেশী নারায়ণ সবই বুঝলেন। তিনি হেসে বললেন বলিকে ঃ

'দৈত্যরাজ, কুশ দিয়ে গাড়ুর নলের মুখ পরিষ্কার কর।'

দৈত্যপতি হাতে কুশ নিয়ে যেমন গাড়ুর নলে ঢুকিয়েছেন নারায়ণের ইচ্ছায় অমনি কুশ বজ্রের শক্তিতে আঘাত করলো বজ্রকীটের চোখে। শুক্রাচার্য কানা হয়ে সেই স্থান ছেড়ে পালালেন।

বলি তখন বামনকে বললেন ঃ

'হে ব্রাহ্মণ—ত্রিপাদ ভূমি গ্রহণ ক'রে আমার যজ্ঞকে সার্থক করুন।'

দেখতে দেখতে বামন বিরাট আকৃতি ধারণ করলেন—তাঁর মাথা গিয়ে ঠেকলো আকাশে—ত্রিভুবন যেন ভরে গেল তাঁর দেহের আকারে। একপদে তিনি সমস্ত পৃথিবী চেপে ধরলেন, আর একপদে ঢেকে ফেললেন সপ্তস্বর্গ। আর তো পা রাখবার জায়গা নেই!

তখন বামন বললেন ঃ

'প্রতিজ্ঞা পূর্ণ কর দৈত্যরাজ—আমার তৃতীয় পদের স্থান দাও।'

বিনয়ে মাথা নুইয়ে বলি বললেন ঃ

'আমাকে প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করতে দাও প্রভু, নরকে যেন না যেতে হয় আমাকে। এই নাও আমার মস্তক—এর উপর তুমি তৃতীয় পদ স্থাপন কর।'

নারায়ণ বলির মাথার উপর পা দিয়ে তাঁকে পাতালে পাঠিয়ে দিলেন।

দেবতারা আবার স্বর্গরাজ্য ফিরে পেলেন।





দধীচি-কাহিনী

ব্রহ্মার এক পুত্রের নাম ত্বষ্টা। তেজস্বী ত্বষ্টা বিয়ে করলেন এক অসুরকন্যাকে। কালক্রমে এই অসুরকন্যার এক পুত্র হ'লো। পুত্রের নাম রাখা হ'লো ত্রিশিরা।

ত্রিশিরার তিনটি মুণ্ড। একমুখে সে বেদপাঠ করে, একমুখে রাম নাম নেয়, আর একমুখে মদ্য পান করে। মুনিরা যখন যজ্ঞ করেন, ত্রিশিরা তখন যজ্ঞের ভাগ চুরি ক'রে নিয়ে দেয় অসুরদের। তাই মাতুল গোষ্ঠীতেও তার যথেষ্ট আদর!

দেবগণ ত্রিশিরার এই অপকর্মের কথা নিবেদন করলেন ইন্দ্রের নিকট। ইন্দ্র ত্রিশিরার উপর খুব রেগে গেলেন। দেবতারা তাঁর রাগ দমন করবার জন্য ইন্দ্রকে অনেক অনুনয়

বিনয় করলেন—কিন্তু ইন্দ্রের তাতে রাগ কমলো না। তিনি খড়্গ দিয়ে ত্রিশিরাকে হত্যা করলেন।

ক্রমে ক্রমে এই সংবাদ পৌঁছুলো ত্রিশিরার পিতা ত্বষ্টার কানে! তিনি ঠিক করলেন—পুত্র-হত্যার প্রতিশোধ নিতে হবে। এই ভেবে ত্বষ্টা যজ্ঞ আরম্ভ করলেন। দেবতারা যখন এ সংবাদ শুনলেন, তখন তাঁরা ভয়ে কাঁপতে লাগলেন।

ত্বষ্টা যজ্ঞ করছেন—সে এক সাংঘাতিক যজ্ঞ। যজ্ঞ শেষ হ'লে তাতে ইন্দ্রের অনিষ্ট কামনায় যখন আহুতি দিলেন, তখন যজ্ঞকুণ্ড থেকে বেরিয়ে এলো মহাবলবান এক পুত্র—তার নাম রাখা হ'লো বৃত্রাসুর।

পরম তেজস্বী যুবক এই বৃত্রাসুর। ত্রিভুবনে কাউকে সে ভয় পায় না। ওদিকে সে কিন্তু আবার খুব বিষ্ণুভক্ত। ফলে ইন্দ্রও তার ভয়ে অস্থির হ'য়ে উঠলেন। বৃত্র একদিন সৈন্য সংগ্রহ করে স্বর্গরাজ্য আক্রমণ করল। ইন্দ্র পরাজিত হ'য়ে স্বর্গরাজ্য ছেড়ে পালালেন। বৃত্র হ'লো তখন স্বর্গের রাজা। অন্য দেবতারাও সব প্রাণভয়ে আশ্রয় নিলেন ব্রহ্মার কাছে।

ব্রহ্মা ধীরে সুস্থে দেবতাদের মুখে শুনলেন বৃত্রাসুরের কাহিনী। বৃত্রাসুরের ভয়ে যে দেবতারা আত্মগোপন করতে বাধ্য হয়েছেন, সেকথাও দেবতারা লুকোলেন না। তারপর তাঁদের কাতর প্রার্থনা জানালেন ঃ

'প্রভু, আপনিই এখন আমাদের গতি। এ বিপদ্ থেকে যদি উদ্ধার না করেন, তবে আমাদের আর কোন উপায়ই নেই।'

কিন্তু ব্রহ্মাও এ বিষয়ে নিরুপায়। তিনি বললেন ঃ

'দেবগণ, ত্বষ্টানন্দন বৃত্র দেবতাদের অবধ্য—আমারও কিছু করবার শক্তি নেই। চল যাই, অগতির গতি নারায়ণের কাছে —দেখি, তিনি যদি এর একটা কিছু বিহিত করতে পারেন।'

এই বলে ব্রহ্মা দেবতাদের সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হলেন গোলোকধামে। সেখানে নারায়ণের দেখা পেয়ে দেবগণ সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন।

নারায়ণ তাঁদের সমাদর জানিয়ে আসন গ্রহণ করতে বললেন।

করজোড়ে দেবতাদের সঙ্গে ব্রহ্মাও বলতে লাগলেন ঃ

'প্রভু, আমাদের প্রার্থনা শুনুন। ত্বষ্টার পুত্র বৃত্রের অত্যাচারে আজ আমরা নিপীড়িত। দুষ্ট বৃত্র দেবতাদের সমস্ত অধিকার কেড়ে নিয়েছে, তাঁদের স্বর্গছাড়া করেছে, এমন কি ইন্দ্রত্বও আজ তারি অধিকারে। দেবতারা আজ দৈত্যের ভয়ে পৃথিবীতে মানুষের মত বাস করছে। আমাদের এমন শক্তি নেই যে দুরাত্মার শাস্তি বিধান করতে পারি। এখন আপনিই একমাত্র গতি—আমাদের রক্ষা করুন।'

দেবতাদের কাতর নিবেদনে নারায়ণের মন গললো। তিনি বললেন ঃ

'বৃত্র আমার পরম ভক্ত—কাজেই আমি তাকে বধ করতে

পারি না। তবে ভয় নেই, অচিরেই তোমাদের দুঃখ দূর হবে। তোমরা এক কাজ কর, দধীচি মুনির অস্থি নিয়ে এসে বজ্র তৈরী করো—সেই বজ্রের আঘাতেই বৃত্রাসুরের মৃত্যু হবে।'

নারায়ণের এই কথায় ইন্দ্র কিন্তু খুব আশ্বাস পেলেন না। তিনি বললেন ঃ

'দেহত্যাগ না করলে তো অস্থি পাওয়া যাবে না। দধীচি কেন দেহত্যাগ করবেন? মানব-জন্ম সহজে লাভ করা যায় না, ব্রাহ্মণ-জন্ম লাভ করা তো আরও কঠিন। দধীচি সেই ব্রাহ্মণ-জন্ম লাভ করেছেন—আমাদের জন্য তিনি সেই দেহ ত্যাগ করবেন কেন?'

নারায়ণ হেসে বললেন ঃ

'ইন্দ্র, দধীচি কিরূপ পরোপকারী তা তো তোমার অজানা নয়? পূর্বে যে তুমি দধীচির মাথা কেটে ফেলেছিলে সে কথা কি ভুলে গেছ?'

দেবগণ আগ্রহের সহিত বললেন ঃ

'প্রভু, কি সে কাহিনী, দয়া ক'রে বলুন।'

তখন নারায়ণ সে কাহিনী বলতে লাগলেন।

এক সময় স্বর্গ-বৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয় গিয়েছিলেন দধীচির কাছে শিষ্যত্ব গ্রহণ করবার জন্যে। মুনি আনন্দের সঙ্গে রাজী হলেন এবং পরদিন তাঁদের আবার তাঁর নিকট যেতে বললেন। অশ্বিনীকুমারদ্বয় বিদায় হলেন। এখন নারদ চুপি চুপি এ সংবাদ

শুনেছিলেন, তিনি গিয়ে ইন্দ্রকে সব কথা জানালেন। ইন্দ্র তখনই এসে শাসিয়ে গেলেন মুনিকে—যদি দধীচি মুনি অশ্বিনী-



দধীচি মুনি ও অশ্বিনীকুমারদ্বয় (৬৯ পৃষ্ঠা)

কুমারদের কোন বিদ্যা শিক্ষা দেন, তবে ইন্দ্র দধীচির মুণ্ড ছেদন করবেন।

ইন্দ্র যে-বিদ্যাবলে স্বর্গের রাজা—দধীচির সেই বিদ্যা জানা ছিল; অশ্বিনীকুমারদ্বয়ও সেই বিদ্যাই শিখতে গিয়েছিলেন দধীচির কাছে। এই জন্যই ইন্দ্র এত ভয় পেয়েছিলেন।

পরদিন প্রভাতেই অশ্বিনীকুমারদ্বয় দধীচির কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তখন দধীচি মুনি ইন্দ্রের ভয় দেখানোর কথা জানালেন। অশ্বিনীকুমারদ্বয় তখন দধীচিকে আশ্বাস দিলেন যে, সঞ্জীবনী বিদ্যার বলে তাঁরা দধীচির কাটামুণ্ড জুড়ে দেবেন। এই বলে তাঁরা প্রস্তাব করলেন যে এখুনি তাঁরা দধীচির মুণ্ড কেটে তা নিজেদের নিকট রেখে দিয়ে দধীচির দেহে একটা ঘোড়ার মাথা জুড়ে দেবেন। সেই ঘোড়ার মাথাই অশ্বিনীকুমারদের বিদ্যা শেখাবে। তারপর ইন্দ্র এসে সেই মাথা কেটে ফেললে তাঁরা তাঁদের কাছে রেখে দেওয়া দধীচির মাথা তাঁর দেহে জুড়ে দেবেন।

দধীচি তাতে রাজী হ'লে অশ্বিনীকুমারেরা তাঁর মাথা কেটে সেই জায়গায় একটা ঘোড়ার মাথা জুড়ে দিলেন।

নারদ ছিলেন তক্কে তক্কে—তিনি দৌড়ে গিয়ে খবর দিলেন ইন্দ্রকে। ইন্দ্র চটেমটে তখনই এসে দধীচির মাথা কেটে সেই ঘোড়ার মাথাটাই নিয়ে চলে গেলেন।

অশ্বিনীকুমারদের দূতেরাও কাছাকাছি ছিল, তারাও গিয়ে খবর দিল। অশ্বিনীকুমারদ্বয় চলে এলেন চট্‌পট্‌, এসে দধীচির দেহে তাঁর মাথা জুড়ে দিলেন।

কাহিনীটি বলে নারায়ণ দেবতাদের দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ

'তবেই বোঝো—দধীচি পরোপকার করতে ভয় পান না! তিনি অনায়াসে পরের উপকারের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত। কাজেই ভয় পেয়ো না দেবরাজ, দধীচির কাছে গিয়ে তাঁর হাড় প্রার্থনা কর। আমি বলছি, তোমাদের প্রার্থনা অপূর্ণ থাকবে না।'

এই বলে নারায়ণ দেবতাদের বিদায় দিলেন। দেবতারা নারায়ণকে প্রণাম ক'রে চললেন দধীচি মুনির আশ্রমে। তাঁরা যাবার সময় সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেলেন অশ্বিনীকুমারদের।

সকল দেবতাকে একসঙ্গে এসে আশ্রমে ভিড় জমাতে দেখে মুনি মহাব্যস্ত হ'য়ে সকলকে পাদ্য অর্ঘ্য আসন দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন তাঁদের আগমনের কারণ।

দেবতাদের মুখপাত্ররূপে ইন্দ্র বললেনঃ

'মুনিবর, যে কারণে আমরা এখানে এসেছি, তা বলতে যথেষ্ট সংকোচ বোধ করছি। কিন্তু তবু না বলেও উপায় নেই। দুষ্ট বৃত্রাসুর দেবতাদের স্বর্গ থেকে তাড়িয়ে দিয়ে ইন্দ্রত্ব দখল করেছে। তার প্রতিকারের জন্য আমরা গিয়েছিলাম নারায়ণের কাছে। নারায়ণ আমাদের বললেন যে তোমরা সকলে মিলে দধীচির কাছে যাও। দেবতাদের উপকারের জন্য তিনি নিজের ইচ্ছায় প্রাণ ত্যাগ করবেন—তারপর তাঁর বুকের হাড় দিয়ে বজ্র তৈরী ক'রে সেই বজ্র দিয়ে বৃত্রের ধ্বংস কর।'

এই বলে ইন্দ্র দধীচিকে সম্বোধন ক'রে সবিনয়ে নিবেদন করলেনঃ

'মুনিবর, এক্ষণে আমাদের কাতর অনুরোধ—আপনি দেবতাদের জন্য দেহত্যাগ ক'রে আপনার পবিত্র অস্থি আমায় দিন।'

দধীচি বললেন ঃ

'দেবরাজ, এ আপনার কি কথা! আপনাদের উপকারের জন্য আমি প্রাণ বিসর্জন দেবো কেন? যে মানবজন্ম সহজে লাভ করা যায় না, সেই মানবজন্ম, তার উপর ব্রাহ্মণ-জন্ম লাভ করেছি, সে কি এমনভাবে বিলিয়ে দেবার জন্যে? আমি মরলে আপনাদের কাজ হবে বটে, কিন্তু তাতে আমার কোন উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হবে না। কাজেই শুনুন দেবরাজ, বৃথা আমায় অনুরোধ করবেন না।'

দধীচির কথা শুনে সবাই অবাক্ হ'য়ে গেলেন। দেবতারা সব মাথা হেঁট ক'রে বসে রইলেন। ভয়ে আর কারো মুখ থেকে কথা বেরোয় না।

দেবতাদের এই অবস্থা দেখে হেসে দধীচি বললেন ঃ

'দেবগণ, ভয় পাবেন না—আমি আপনাদের সঙ্গে একটু রহস্য করেছিলাম। আমার দেহের সাহায্যে যদি কারো বিন্দু-মাত্রও উপকার হয়, তাতেই আমার জন্ম সার্থক হবে বলে মনে করি। কত পুণ্য করেছিলাম বলেই আপনাদের উপকারে আমার এই দেহ ধন্য হবার সুযোগ এসেছে!'

দধীচির কথা শুনে ইন্দ্র আশ্বস্ত হ'য়ে বললেন ঃ

'মুনিবর, এ আপনার মৃত্যু নহে, এ মহাজীবন। লক্ষ কোটি বছর আপনি জীবিত থাকবেন মানুষের মনে—আপনার জন্ম সার্থক, মৃত্যুও সার্থক।'

তখন যোগাসনে বসে মুনিবর দেহ ত্যাগ করলেন। স্বর্গ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হ'লো।

দেবরাজ তখন বিশ্বকর্মাকে ডেকে বজ্র তৈরী করতে বললেন। বিশ্বকর্মা তখনই দধীচির অস্থি দিয়ে বজ্র তৈরী ক'রে দিলেন।

এরপর দেবতারা নূতন আশায় বুক বেঁধে অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। এবার অসুররা আর দেবতাদের সঙ্গে পেরে উঠল না।

ইন্দ্র সেই বজ্রের সাহায্যে বৃত্রাসুরকে বধ ক'রে স্বর্গরাজ্য পুনরায় দখল করলেন।



চন্দ্রকেতু · চন্দ্রাবতী কাহিনী

চন্দ্রের কন্যা চন্দ্রাবতী—জন্মান্তরে জন্ম নিলেন নীলধ্বজ রাজার গৃহে। অতি সুকুমারী কন্যা—রূপে গুণে তাঁর তুলনা নেই। কন্যা যখন যৌবনে উপনীত হ'লো তখন রাজা নীলধ্বজ ভাবলেন ঃ কার হাতে এই কন্যাকে তুলে দেই! এমন কন্যার উপযুক্ত সুপাত্র পাই কোথায়?

ভেবে চিন্তে তিনি স্বয়ংবর-সভা ডাকলেন। নানা দেশ থেকে যত রাজ-রাজড়া সবাই এসে উপস্থিত হলেন সেই স্বয়ংবর-সভায়। অন্য রাজাদের সঙ্গে এলেন ইক্ষ্বাকু বংশের রাজা চন্দ্রকেতু।

চন্দ্রকেতুকে দেখে চন্দ্রাবতীর এতই ভাল লাগলো যে অন্য রাজাদের রূপ তাঁর চোখেই লাগলো না। তিনি আর বিচার-বিবেচনা না করেই চন্দ্রকেতুর গলায় মালা পরিয়ে দিলেন।

তারপর চন্দ্রকেতু চন্দ্রাবতীকে বিয়ে ক'রে নিজ রাজ্যে ফিরে এলেন।

চন্দ্রকেতু ছিলেন অতি ধার্মিক আর চন্দ্রাবতীকে ভালোও বাসতেন খুব।

চন্দ্রকেতু আর চন্দ্রাবতী উভয়েই একমাস ধরে চান্দ্রায়ণ ব্রত করলেন। যেদিন ব্রত উদ্‌যাপিত হবে, সেদিন চন্দ্রকেতু ব্রতের কিছুটা নিয়ম ভঙ্গ করলেন। তাঁর ব্রতভঙ্গে চন্দ্রাবতী আপত্তি করলেন। কিন্তু চন্দ্রকেতুর মতিভ্রম হয়েছিল। তিনি সে-কথা কানে নিলেন না।

এই পাপে একান্ত অসময়ে চন্দ্রকেতুর মৃত্যু হ'লো।

চন্দ্রকেতুর মৃত্যুর পর দুই যমদূত এসে তাঁকে বেঁধে নিয়ে গেলেন যমপুরে। তখন যমরাজা তাঁর সামনে এসে বললেন ঃ

'চন্দ্রকেতু, তুমি জীবনে অনেক পুণ্য অর্জন করেছ, আর অল্প কিছু পাপও করেছ—উভয় কর্মফল ভোগেরই তুমি সুযোগ পাবে। আগে পাপের ফল ভোগ করতে চাও, অথবা আগে পুণ্যফল ভোগ করতে চাও—তোমার যা ইচ্ছা তাই বল—আমি সেরূপ ব্যবস্থা করবো।'

চন্দ্রকেতু ভাবলেন—পাপের পরিমাণ যখন অল্প, তখন আগে পাপের ফল ভোগ ক'রে নেওয়াই সংগত। যমকে তিনি তাঁর সেই অভিমত জানালেন।

যমের আদেশে চন্দ্রকেতু শকুনি পক্ষীরূপে জন্মগ্রহণ করলেন।

চন্দ্রাবতা এ কাহিনী জেনে বাপের বাড়ী এসে রাজা নীলধ্বজকে সব কথা খুলে বললেন।

রাজা রাজপুরোহিতের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে স্থির করলেন—কন্যাকে আবার স্বয়ংবর-সভা ক'রে অন্য বরে দান করবেন। কিন্তু চন্দ্রাবতী রুখে দাঁড়ালেন। তিনি বললেন ঃ

'আমার স্বামী যেখানে শকুনি পক্ষীরূপে বাস করছেন, আমাকে সেখানে পাঠাবার ব্যবস্থা করুন।'

অগত্যা তাঁকে সেই শকুনি পক্ষীর কাছে নিয়ে যাওয়া হ'লো। স্বামীর কাছে এসে তাঁর কষ্ট দেখে চন্দ্রাবতীর দুঃখ উথলে উঠলো। তিনি বললেন ঃ

'ধর্মরাজ অবিচার ক'রে তোমায় এই শাস্তি দিয়েছেন। আমি তাঁর এই অবিচারের জন্য তাঁকে অভিশাপ দেবো।'

সে-কথা ধর্মরাজের কানে গেলো। তিনি শাপের ভয়ে সেখানে এসে উপস্থিত হ'য়ে বললেন ঃ

'চন্দ্রাবতী, তোমার স্বামী যে অল্প অপরাধ করেছিল, তার শাস্তি হ'য়ে গেছে—আমি তাকে মুক্তি দিচ্ছি। তার পাপের ফল পূর্ণ হয়ে গেছে—এখন সে পুণ্যের ফল ভোগ করবে।'

শকুনি পক্ষীরূপ ছেড়ে চন্দ্রকেতু দিব্যদেহ পেলেন। তারপর চন্দ্রাবতীর সঙ্গে দিব্যরথে চড়ে স্বর্গে গেলেন।

বিশ্বামিত্র-বশিষ্ঠ কাহিনী

বিশ্বামিত্র ছিলেন রাজা গাধির পুত্র। পিতা মারা যাওয়ার পর তিনি নিজে হলেন রাজা। কিন্তু রাজা হয়েও মহামুনি বশিষ্ঠকে তিনি করতেন হিংসা!

তিনি হ'তে চান ব্রহ্মর্ষি। কিন্তু বশিষ্ঠ তাঁকে ব্রহ্মর্ষি ব'লে স্বীকার করেন না।

এই নিয়ে দু'জনের মধ্যে বিরোধ ক্রমশঃ ঘোরালো হ'য়ে উঠলো। ক্রুদ্ধ বিশ্বামিত্র মন্ত্র-বলে এক রাজাকে রাক্ষস ক'রে দিলেন। তারপর সেই রাক্ষসকে বললেন: 'বশিষ্ঠের একশত পুত্র আছে, তাদের তুমি খেয়ে ফেল।'

একটি একটি ক'রে বশিষ্ঠের সমস্ত পুত্র রাক্ষসের পেটে গেল। কিন্তু এতেও ক্ষমাশীল বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের উপর রাগ করলেন না।

একদিন বশিষ্ঠ তাঁর স্ত্রী অরুন্ধতীকে বললেন: 'বিশ্বামিত্রের কাছ থেকে কিছু লবণ নিয়ে এস।'

অরুন্ধতী এতে আশ্চর্যান্বিত হ'য়ে বললেন: 'যে বিশ্বামিত্র আমার শত পুত্রের মৃত্যুর কারণ হয়েছে, তার কাছে আমাকে লবণ ভিক্ষা করতে পাঠাচ্ছ?'

মহামুনি বশিষ্ঠ উত্তরে বললেন যে, তিনি বিশ্বামিত্রকে ভালবাসেন। কেবল তাই নয়—বিশ্বামিত্রকে তিনি ভালবাসেন বলেই তাঁকে ব্রহ্মর্ষি বলে স্বীকার করছেন না। তিনি চান বিশ্বামিত্র ব্রহ্মর্ষির সমস্ত গুণের উপযুক্ত হয়ে উঠুক।



একটি একটি ক'রে সমস্ত পুত্র
রাক্ষসের পেটে গেল।
(৭৮ পৃষ্ঠা)

এদিকে সেদিন বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের ঘরের পাশে এসে লুকিয়েছিলেন। ভেবেছিলেন, সেদিন বশিষ্ঠ যদি তাঁকে ব্রহ্মর্ষি ব'লে স্বীকার না করেন, তা হ'লে তিনি তাঁকে হত্যা করবেন।

কিন্তু অরুন্ধতীর সঙ্গে বশিষ্ঠের কথাবার্তা শুনে বিশ্বামিত্র ছুটে গিয়ে বশিষ্ঠের পায়ে পড়লেন এবং বললেনঃ 'আপনি সত্যি মহৎ, আমি অতি ক্ষুদ্র। আমি ব্রহ্মর্ষি হতে চাই না। আমায় ক্ষমা করুন।'

মহামুনি বশিষ্ঠ তখন বিশ্বামিত্রকে আশীর্বাদ ক'রে বললেনঃ 'বিশ্বামিত্র, তোমার সমস্ত অপরাধ আমি ক্ষমা করলুম। আজ থেকে তুমি ব্রহ্মর্ষি হলে।'

অহংকার ও ক্রোধ ত্যাগ করায় ক্ষত্রিয় বংশে জন্মগ্রহণ করেও বিশ্বামিত্র হলেন ব্রহ্মর্ষি।

সমাপ্ত